

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি

পারিবারিক ধ্বংস?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমিনা আক্তার

রোলঃ 23090120485

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি

পারিবারিক ধ্বংস?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমিনা আক্তার

রোলঃ 23090120485

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস? ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমিনা আক্তার, আইডিঃ 23090120485 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমিনা আক্তার

(স্বাক্ষর)

আমিনা আক্তার

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090120485

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
ফেমিনিজমের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ.....	8
প্রথম ওয়েভ.....	9
দ্বিতীয় ওয়েভ.....	10
তৃতীয় ওয়েভ.....	12
চতুর্থ ওয়েভ.....	13
নারীর বিশেষ সুবিধা.....	13
নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর.....	16
নারী নেতৃত্ব.....	25
ক্ষমতা অধিকার নয়, দায়িত্ব.....	30
পুরুষদের প্রতি জাতিগত ঘৃণা কি অবিচারের সমাধান?.....	32
পশ্চিমের পুতুল মালার বিযুক্ত নারীবাদ.....	35
মুসলিম নারীবাদ : উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন.....	38
ইসলামে নারীর সম্মান.....	44
নারীবাদীরা সেক্যুলার সিস্টেমের পণ্য.....	47
সেক্যুলার লিবারেলিজমের 'উন্মুক্ত প্রণয় অসংগতি'.....	49
জব সেক্টরে নারী.....	56
কাজের কাক্সিকৃত ধরন ও সেক্টর.....	59
নারীর কাজের পরিবেশ.....	62
নারীর কাজের ব্যাপারে র্যাভের অবস্থান ও তার পর্যালোচনা.....	67
মুসলিম নারীদের পশ্চিমাদের কাতারে নেওয়ার জন্য আকর্ষণ করা.....	74
জন্মনিয়ন্ত্রণ.....	77
লিবারেলিজম কেন আপনার নিকাব পরিধানে বাধা দেয়?.....	89

ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়, ঈমান; প্রভু নই, মুমিন.....	95
নারীবাদীদের চোখে নারীরা.....	108
শাস্ত্রত বন্দিত্ব	123
তারা চার	131
রেফারেন্স	135

ভূমিকা

নারী হলো মানবসভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সে কন্যা, স্ত্রী, মা ও সমাজ নির্মাণের অন্যতম স্তম্ভ। সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে; কখনো তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনো সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। কিন্তু আধুনিক যুগে নারী অধিকার নিয়ে সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত মতাদর্শগুলোর মধ্যে একটি হলো ফেমিনিজম বা নারীবাদ।

ফেমিনিজমের মূল দাবি ছিল নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া— শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে সমান অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু সময়ের প্রবাহে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, দর্শন ও প্রয়োগ ক্রমশ বিকৃত হয়ে যায়। আজকের তথাকথিত “নারীবাদ” নারীর প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা না করে বরং পরিবারব্যবস্থা, নৈতিকতা ও সামাজিক ভারসাম্য ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

উপনিবেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত প্রত্যেক ব্যক্তিই এ বিষয়টি স্বীকার করবে যে, ইসলামী বিশ্বে পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে ইউরোপের অন্যতম টার্গেট ছিল মুসলিম নারী সমাজ। মুসলিম সমাজে তাদের কর্তৃত্ব ও আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী সংক্রান্ত বিষয়াবলি কে তারা প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

বর্তমানেও আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে নারী সংশ্লিষ্ট অশার কিছু স্লোগানকে। নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার, জেভার ইকুয়ালিটি, (লিঙ্গ সমতা) এর মত মুখরোচক স্লোগানগুলো মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ পলিসিতে পশ্চিমাদের হস্তক্ষেপের অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে। যার দরুন পশ্চিমের মানসিক দাসত্বকে মুসলিম নারীরা স্বাধীনতা ও প্রগতি হিসেবে বিশ্বাস করে নিচ্ছে।

জাতিসংঘ ও আমেরিকার পলিসি মেকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো র‍্যান্ড কর্পোরেশন। এই র‍্যান্ড কর্পোরেশন পশ্চিমা রাজনৈতিক পলিসিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে মুসলিমদের আদর্শ ও জ্ঞানগতভাবে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার জন্য এমন অনেক প্রাচ্যবাদী প্রতিষ্ঠানই কাজ করে যাচ্ছে।

আজ থেকে অনির্দিষ্টকাল পরে যখন ইসলামিক খিলাফাহর শিশুরা আমাদের সময়ের ইতিহাস পড়বে,তখন তারা কিভাবে দেখবে আমাদের নারীদের? তারা দেখবে একটি অসুস্থ সমাজ,একটি অসুস্থ বিশ্ব।তারা পড়বে ২-৩ বছর বয়সী অসুস্থ বাচ্চাদের কথা,যারা মায়ের আদর পায় না,মায়ের উষ্ণতা পায় না।কাজের বুয়ার আদরে বড় হওয়া শিশুদের ভবিষ্যৎ দেখে চমকে উঠবে ওরা।অবাক হয়ে ভাববে,এ বাচ্চারা মায়ের কোলে শুয়ে মুসআব বা আসহাবে সুফফার গল্প শোনে না? কিভাবে সম্ভব? রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে সাহায্য করতে করতে আড্ডা দেয় না?সন্তান এবং মায়ের হাজার বছরের যে সম্পর্ক,তা এ সভ্যতায় এসে কিভাবে ধ্বংসে পড়ল,তা দেখে অবাক হবে তারা।বার বার সিজদায় পড়ে যাবে এই সভ্যতায় তাদের না জন্মের জন্য। আল্লাহ কে ধন্যবাদ জানাবে মাকে অনেক আপন করে পাওয়ার জন্য। মায়ের স্নেহ তাদের কাছে ফর গ্রান্টেড হবে না।

তারা পড়বে অসহায় কিছু নারীর গল্প। পরিবার চাকরি সব চালিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে বিবর্ণ কিছু চেহারা দেখবে।দেখবে রাজা-বাদশাদের আমলের বাইজিদের মতো তার জন্য কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা, মিডিয়া, রাস্তার বিলবোর্ড- সবকিছু তাদেরকে চাপ দিয়েছে। তাদের ভালোবাসা, মর্যাদা, মাতৃত্ব সবকিছু কিভাবে ভুলে গিয়েছে পৃথিবী এবং বাধ্য করেছে শরীর বেঁচে টাকা জোগাড় করতে।টাকা বাদে কোথাও সম্মান রাখা হয়নি তার- না পরিবারে না সমাজে।

তারপর তারা পড়বে একদল পুরুষের গল্প। সেসব পুরুষ-যাদের কাছে স্বার্থ বাদে আর কোন কিছুর কোন মূল্য নেই। তারা স্বার্থের জন্য সব করতে পারে।স্বার্থের জন্য পরিবার কেউ ব্যবহার করতে পারে। শিশু থেকে শুরু করে সবকিছুকেই তারা ব্যবহার করেছে তাদের ব্যবসার জন্য। এ পুরুষরাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের কাজে নারীদেরকে ইচ্ছামত ব্যবহার করেছে,দুর্বল দেখে টাকা না দিয়ে কাজ অনেক বেশি। তাদের অধিকার রক্ষায় পুরুষও ছিল না কোনো।একদিন নারীরা যখন ঘুরে দাঁড়াল,নিজেদের অধিকার নিয়েই সোচ্চার হলো,সে পুরুষরা টেবিল ঘুরিয়ে দিলো।নারীদের শরীরকে ব্যবহার করতে শুরু করল,শরীর বেঁচে নিজেদের ব্যবসা বড় করল।নারীদের কেড়ে নিল তাদের পরিবার থেকে,বাচ্চাদের থেকে। নারীকে বলা হলো,টাকাই তোমার সম্মান, সন্তান -পরিবারের জন্য জন্ম হয়নি তোমার।

সনাতন ধর্মের সতীদাহ প্রথা দেখে আমাদের যেমন অবাক লাগে,নাক সিঁটকে উঠি আমরা,ঠিক সেভাবেই মনের ভেতর থেকে এ সভ্যতার সবকিছুকে ঘৃণা করবে খিলাফাহর যুগের শিশুরা।তাকে ইতিহাসের বই পড়বার সময় মাকে সে প্রশ্ন করবে না,কেন এ সভ্যতার গুরুরা এমন ছিল।কারণ সে জানে আবু জাহল,ফেরআউন সহ যুগে যুগেই জালিম - কাফিররা

এমন। তারা সবসময় স্বার্থবাদী। আল্লাহকে নিয়ে তারা ভাবে না, নিজেদের খোদা মনে করে তারা। জাহেলিয়া অনেক বেশি বর্বর হবে, বিকৃত হবে এটি স্বাভাবিক। জাহেলিয়ার হাতে পৃথিবীর সবাই কষ্ট পাবে এটি বাস্তব। বরং অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করবে, মা! সে সভ্যতায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত কেউ ছিল না, যে তাতারদের মতো লিবারেলদের কে তাড়িয়ে দেবে? ছিলনা আইয়ুবীর মত কেউ? ইমাম আহমদের মত কেউ ছিলনা যে মুতাজিলাদের মত খন্ডন করে অসার করে দেবে নারীবাদীদের যত কুযুক্তি? আচ্ছা সে সভ্যতায় কি কোন মুসলিমই ছিল না?

সত্যি ই তো? মুসলিম কি নেই?

এটিই সবচেয়ে হতাশার জায়গা। ৯০% মুসলিমের এ দেশেই নয়, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে, সমগ্র আরব বিশ্ব, মুসলিম বিশ্বজুড়ে মুসলিম নামের নারীরা সরে গিয়েছে ইসলাম থেকে অনেক দূরে। স্কুল- কলেজের বারান্দা দিয়ে খিলখিল করে দৌড়াতে থাকা বালিকাদের জিগ্যেস করুন, নারীবাদীদের মতোই উত্তর পাবেন। ফিকহের পাতা উল্টে, শরীয়তের কাছে এসে জিজ্ঞেস করার মত সময় কারও নেই, আল্লাহ কী বলছেন, রাসুল ﷺ কী বলছেন। তারা জানে কি বলছেন। কারণ তাদেরকে আসল ইসলাম শিখিয়েছে সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা, সেকুলার মিডিয়া। সে ইসলামে সব আছে, শুধু আল্লাহ যা বলেছেন তা বাদে। সে ইসলামে সব করা যায়, কেবল সাহাবিরা যা করেছেন তা বাদে। এ ইসলামের সাথে কোনো কিছুর কোনো সংঘর্ষ নেই। নারীবাদের একটি ইসলামি ভাঙ্গনও দাঁড় করানো হয়েছে – মুসলিম নারীবাদ।

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তাআ'লা আমাদেরকে এই সকল পশ্চিমা বস্তা পঁচা অপসংস্কৃতি থেকে হেফাজত করুন, আমীন।

ফেমিনিজমের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ফেমিনিজম বা নারীবাদ বলতে বোঝায়, একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন; যার উদ্দেশ্য নারীর সমানাধিকার ও আইনি সুরক্ষা। এর আওতায় রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক থিয়োরি ও দর্শন। ১৯৪২ সালে ক্যাথরিন হেপবার্ন সর্বপ্রথম নারীবাদী আন্দোলন কথাটি ব্যবহার করে ওমেন অফ দ্যা ইয়ার সিনেমায় নারীবাদীরা ও পণ্ডিতগণ এই আন্দোলনের ইতিহাস কে তিনটি ওয়েভে ভাগ করেন।

প্রথম ওয়েভ

একটা লম্বা সময় ধরে ব্রিটেন ও আমেরিকায় চলমান নারীবাদী কার্যক্রমকে প্রথম ওয়েব ধরা হয়। এর সময়কাল ছিল ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। মূলত এর ফোকাস ছিল নারী-পুরুষ সমান বন্দোবস্ত ও সম্পত্তির অধিকারের দাবিতে এবং শ্যাটেল ম্যারেজ(স্বামী স্ত্রী এবং সন্তানাদির মালিক) এর বিরুদ্ধে। ১৯ শতকের শেষদিকে এই আন্দোলন পরিণত হয় নারীর রাজনৈতিক শক্তি বাড়ানোর দাবিতে, বিশেষ করে ভোটের অধিকারের আন্দোলনে।

আরও স্পেসিফিক বলতে গেলে, ১৯৪৮ সালে দুই শতাব্দিক নারী একত্রিত হন নিউইয়র্কের এক চার্চে। একে নাম দেওয়া হয় Seneca Falls Convention. নারী অধিকার ও সামাজিক-নাগরিক- ধর্মীয় ইস্যুগুলো আলোচনা করে তারা ১২ টি রেজুলেশন পাশ করেন। সে সময় নারী আন্দোলন ‘দাসপ্রথা-বিরোধি’ আন্দোলনের (abolitionist movement) সাথে একাড়া হয়ে চলতে থাকে। কৃষ্ণাঙ্গ নারী নেত্রীরা প্রধান ভূমিকা পালন করেন, কেবল নারীদের ভোটাধিকার ই না, সবার জন্যই ভোটাধিকারের দাবিতে।

কিন্তু পরে নারী আন্দোলনটা কেবল শেতাজ নারীদের আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কয়েকজনের প্রচেষ্টায়। ১৮৭০ সালে যখন 15th amendment passage পাশ করে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়, তখন নারীবাদীরা এই পয়েন্টে আসেন :যারা এক সময় আমাদের দাস ছিল তারা ভোট দিতে পারলে, আমরা কেন পারব না? তবে শুধু ভোটাধিকারের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না, শিক্ষার, চাকুরী, সম্পদের মালিকানা সব বিষয়েই সমাধিকারের দাবিতে চলমান ছিল তাদের আন্দোলন।

১৯১৬ সালে আমেরিকার প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক চালু হয়, নারীর ‘জন্মদানের ইচ্ছাধিকারের’ -প্রথম ফসল হিসেবে।

১৯২০ সালে আমেরিকার কংগ্রেসে ১৯ তম সংশোধনী পাশ হয়। নারীরা পান ভোটাধিকার। মূলত এর পর থেকে ১ম ওয়েভের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে। বিচ্ছিন্ন দাবিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নারী সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে গেলেও ১৯৬০ এর দশকের আগ পর্যন্ত সমন্বিত লক্ষ্যে আন্দোলন চোখে পড়ে না।

দ্বিতীয় ওয়েভ

২য় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুই মেরুতে ভাগ হয়ে যায়। আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লক,সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এই দুই বিশ্বব্যবস্থা, যাকে আমরা স্নায়ুযুদ্ধ নামে চিনি।মহাকাশ বিজয়াভিজান থেকে নিয়ে জলে-স্থলে আধিপত্য বিস্তার, কোনখানেই বাকী নেই। পরস্পরকে অর্থনৈতিকভাবে টেকা দেয়ার প্রচেষ্টাও থেমে নেই।১ম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই বুঝা গিয়েছিল নারীদেরকে কারখানায় আনার লাভটা।পুরুষদের যেতে হয়েছিল যুদ্ধে। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও কারখানাগুলো তে নারীকর্মী ছিল প্রচুর,কেননা পুরুষ নিহত-নিঁখোজ ছিল বহু। সেসময়কার ৩ টি পোস্টার দেখলেই বুঝবেন,নারীদেরকে কারখানামুখী করবার ব্যাপক প্রোপাগান্ডা। একটি বিখ্যাত পোস্টার We Can Do It!, ১৯৪৩ সালে বানিয়েছিলেন J.Howard Miller নারী কর্মীদের উৎসাহ ধরে রাখার জন্য। আরেকটা বিখ্যাত ক্যারেক্টার তৈরি করা হয়েছিল যার নাম Rosie the Riveter,আমেরিকায় অস্ত্র ও সামরিক ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য কারখানায় কর্মরত নারীদের গ্লোরিফাই করে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল,যাতে নারীরা ব্যাপকভাবে এসবে অংশ নেয়।

মজা পেয়ে গেল মালিকেরা,নারীদের শ্রমবাজারে রাখাটা পুঁজিপতিদের ব্যাপক লাভজনক সাব্যস্ত হল।এক,বেতন কম দিতে হত।যার প্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালে করতে হয়েছিল ‘সমান বেতন আইন’। দুই, চাকুরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। মেয়েদের জন্য চাকরি অপশনাল, আর ‘পুরুষের তো না হলেই নয়’। ফলে,পুরুষরা আগের চেয়ে কম বেতনেও শ্রম দিতে তৈরি থাকে।

পুঁজিপতিরা তো এটাই চায়।বেতন কম দিলে পুঁজিপতির পকেটে মুনাফা থাকবে বেশি। তাহলে নারীদের এখন শ্রমবাজারে ধরে রাখতে হবে যেকোনো মূল্যে।আর নারীদের শ্রম ধরে রাখতে হলে করতে হবে ৩ টা কাজ-

১. পরিবার গঠন কে পেছাতে হবে সাবলম্বী হবার নামে।নারীদেরকে পরিবারমুখী থেকে ক্যারিয়ার মুখী করতে হবে। চাকরি, ক্যারিয়ার এসবকে মর্যাদার কাজ হিসেবে বুঝাতে হবে।

২.’ আগে আগে বিয়ে’ - কে ভিলেন বানাতে হবে।

৩.বিয়ে,গর্ভধারণ, বাচ্চাপালন- কে ছোট, ঘৃণ্য কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেন এগুলো করতে নারী অনীহা বোধ করে।

সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতার ময়দানে আবার ফিরিয়ে আনা হল ‘নারীবাদী আন্দোলন’ কে। আগের ঊনবিংশ শতক জুড়ে চলা নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ওয়েভের আপাত সমাপ্তি ঘটেছিল আমেরিকার নারীদের ভোটাধিকার দেবার মাধ্যমে সেই ১৯২০ সালে। ৬০ এর দশকে আবার চাঙা করে তোলা হল ৪০ বছর আগের সেই হাইপ। ১৯৬০ এর দশকের শুরুতে আরম্ভ হয়ে ১৯৮০ এর দশকের শেষ অর্দি ছিল এর সময়কাল। এর ফোকাস ছিল মূলত সব ধরনের বৈষম্যের বিলোপ করে সমতা প্রতিষ্ঠা।

আরও স্পেসিফিক বললে, ১৯৬৩ সালে Betty Friedan এর ‘The feminine Mystique’ প্রকাশিত হয়। ৩ বছরে বিক্রি হয় ৩০ লক্ষ কপি। ১৯৪৯ সালে Simone de Beauvoir এর Second Sex ব্যাপক সাড়া ফেললেও, আগের বইটা ছিল একটা বিপ্লব। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল: সন্তানপালন ও ঘরোয়া কাজকাম নারীকে হতাশ ও অসুখী করে তুলেছে, এটা। আইডিয়াটা নতুন না হলেও ৩০ লক্ষ নারী পাঠকের কাছে আওয়াজটা পৌঁছে গেল। বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারী হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন, তারা আসলে অসুখী। গড়ে উঠল আন্দোলন। এবার ফোকাস আর রাজনৈতিক সমতা না, সামাজিক সমতা। দাবীগুলো যৌনতা ও সম্পর্ক, গর্ভপাতের অধিকার, ঘরোয়া কাজ– এই কেন্দ্রিক। এই বার আন্দোলনের অর্জন গুলো ছিল:

- সমান বেতন আইন, ১৯৬৩
- বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন
- শিক্ষার সমানাধিকার (টাইটেল ৯)
- ১৯৭৩ সালে Roe v. Wade কেস দ্বারা নারীর প্রজননের স্বাধীনতা অর্জন
- নিজ নামে ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি।

সেকেন্ড ওয়েভের চূড়ান্ত পর্যায়ে আন্দোলন কিছুটা উগ্রতায় পরিণত হয় এবং সমাজে নারীবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ভীতি তৈরি করে। নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাবের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে মিস আমেরিকা যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেখানে নারীবাদীরা জমায়েত হয় এবং ব্রা পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে। পুরুষের চোখে যা যা নারীর প্রতীক সেগুলো পরিত্যাগ করার একটি নমুনা। নারী নয়, মানুষ হিসেবে তাদের ভাবতে হবে।

তৃতীয় ওয়েভ

১৯৯০ এর শুরুতে এর আরম্ভ। এর শুরুটাকে বাকি দুটোর মত স্পষ্ট করা যায় না। দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে থার্ড ওয়েভ শুরু হয় মূলত। ১৯৯১ এ Anita Hill কেস আর ১৯৯১ এ Riot Grrrl গ্রুপ। বসের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলা করেন আনিতা হীল। যদিও বস পার পেয়ে যায়, কিন্তু এটা সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ১৯৯২ সালে হাইস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এ ২৪ জন নারী নির্বাচনে জেতেন। এটা আরেকটা রাজনৈতিক বিজয় নারী বাদের।

সেকেন্ড ওয়েভ নারীত্বের প্রতীকগুলোকে বর্জনের ডাক দিয়েছিল। ফলে সমাজ এটাকে ভালোভাবে নেয়নি। এরই প্রতিক্রিয়ায় থার্ড ওয়েব দাগ দেয় এরই প্রতিক্রিয়ায় থার্ড ওয়েভ ডাক দেয় ‘নারীত্বের প্রতীক’গুলোকে আবার গ্রহণের, যেমন : হাই-হিল, মেক-আপ, নারীসুলভ আচরণ। দর্শনটা হলো: ‘নারী-পুরুষ লিঙ্গ আলাদা, দৈহিকভাবে আলাদা। কিন্তু জেন্ডার দৈহিক না, জেন্ডার হলো সামাজিক ভূমিকা এবং এটা একই’।

চতুর্থ ওয়েভ

অনেক নারীবাদী বিগত কয়েক বছর ধরে চলমান #MeToo আন্দোলনকে চতুর্থ ওয়েভ বলেছেন।

নারীর বিশেষ সুবিধা

শুরু থেকেই নারীবাদীরা প্রতিনিয়ত এবং জোরেশোরে দাবি করে আসছে, পুরুষতন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক। এই দাবি থেকে আপনারা মনে করতে পারেন, পুরুষরা নারীদের ভৃত্য বা দাসী হিসেবে গণ্য করে। তবে একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, এটা তাদের আরেকটি মিথ্যাচার। বাস্তবে নারীরা সমাজে এমন অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুবিধা পেয়ে থাকে, যেগুলো লিঙ্গসমতার বিতর্কে কখনো উল্লেখ করা হয় না। জনসম্মুখে যেমন: বাস, ট্রেন বা অন্যান্য জনবহুল জায়গায় একজন পুরুষ নারীকে বসার সিট ছেড়ে দেয়, যাতে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।

কিন্তু এর বিপরীতটা কখনো ঘটে কি? একজন নারী যদি সিটে বসে থাকে, একজন পুরুষকে তার সিট ছেড়ে দিতে হয় না। কিন্তু এই একই কাজ যদি একজন পুরুষ করে, সমাজের কাছে সে চিহ্নিত হবে নিষ্ঠুর ও অবিবেচক বলে। ২০১৬ সালের ২৬ মার্চ অ্যানি পোস্ট তার Where Are the Stand Up Men নামক নিবন্ধে ঠিক সে রকমই একটি একপেশে মন্তব্য তুলে ধরেন। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল Odyssey Online থেকে। তিনি তার প্রথম অনুচ্ছেদটিই পুরুষদের লাঞ্ছিত করার মধ্য দিয়ে শুরু করেন। তার ভাষায় –

‘পুরুষদের কাছে যানবাহনে তাদের জায়গা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিতম্ব নারীদের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’

এই বক্তব্য কতটা নারী কেন্দ্রিক এবং পুরুষ বিদ্বেষী, সেটা বোঝার মত জ্ঞান অ্যানির নেই। এমনকি সে এটা অনুধাবন করতে পারেনি যে, পুরুষরা নারীর সমকক্ষ হলে নারীদের মতো তাদেরও স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করা উচিত নয়। অ্যানির মতো আত্মমগ্ন ফ্যামিনিস্টদের প্রতি আমার পরামর্শ সিট পেতে চান? আগেভাগেই চলে আসুন। যেহেতু আপনারা সমান অধিকার লাভ করেছেন, এখন সমান দায়িত্ববোধ ও আপনাদের উপর ন্যস্ত নারীদের জন্য বিভিন্ন

পাবলিক প্লেসের দরজা খুলে রাখার ক্ষেত্রেও একই ভণ্ডামি পরিলক্ষিত হয়। সামাজিকভাবে পুরুষের জন্য দরজা খুলে রাখা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কোন নারী যদি কোন পুরুষের জন্য দরজা খুলে ধরে রাখে, সমাজ ধরে নেয় – সেই পুরুষের প্রতি তার প্রেম রয়েছে। আর একজন পুরুষ অপর পুরুষের জন্য এই কাজ করলে সব সময় সজাগ থাকতে হয়, যেন কেউ এই উদারতাকে সমালিঙ্গের প্রেম ভেবে না বসে। প্রকারান্তরে যখন নারীরা যখন প্লেন, ট্রেন, নৌকা বা মোটর গাড়িতে ভ্রমণ করেন, দুর্ঘটনায় স্থানান্তর এবং উদ্ধারের ক্ষেত্রে তাদেরই অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

ফেমিনিস্টদের দ্বিচারিতার কথা বলতে গেলে ডেট রেইপের বিষয়টিও সামনে চলে আসে। নারীবাদী প্লাটফর্মে ডেট বিষয়টি বিশাল এক কারবার। নীতির প্রশ্নে এটাকে গুরুতর অভিযোগ বলা যায়। তবে সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে নারীবাদীদের ‘অ্যালকোহলিক ডেট রেইপ’ ক্যাম্পেইন পুরোটাই ভণ্ডামিতে ঠাসা। এই তত্ত্ব অনুসারে একজন নারী যখন অ্যালকোহল সেবন করে নেশাগ্রস্ত থাকে, তখন সে মূলত শারীরিক সম্পর্কের সম্মতি দিতে অক্ষম। কাজেই ফেমিনিস্ট সংস্থাগুলো মাতাল নারীদের সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে সেটাকে পুরুষ কর্তৃক ধর্ষণ হিসেবে অভিহিত করে থাকে। ফেমিনিস্টদের মধ্যে বিষয়টি বহুল প্রচলিত। ২০১৪ সালে মার্গারেট ওয়েন্ট গ্লোব অ্যান্ড মেইলে একটি কলাম লেখে Can She Consent to Sex After Drinking? শিরোনামে। সেখানে সে বলে–

‘একজন নারী কি মাতাল অবস্থায় শারীরিক সম্পর্কের সম্মতি দিতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর উত্তর হলো– না। যদিও এই বাক্যকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ হিসেবেই তারা বলেছে, কিন্তু এর মূল আপদটা পুরুষের ওপর দিয়েই যায়। সোজা কথায় – মাতাল অবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক করা ধর্ষণতুল্য। এখানে কি কোনো দ্বিচারিতা লক্ষ্য করেন? নিশ্চয়ই করেন। খুব চতুরতার সাথে এই তত্ত্বে পুরুষদের সম্ভাব্য ধর্ষক এবং নারীদের তাদের অসহায় শিকার হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যদি দুজন যুবক-যুবতী মদ পান করে এবং মাতাল অবস্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে যুবকটিই কেবল তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। নারী এক্ষেত্রে একান্তই দায়মুক্ত।’

আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন– যখন নারী ও পুরুষ একই ধরনের অপরাধ করে, সবসময়ই কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় পুরুষ ব্যক্তিটিকে। সোজা স্টার এই বিষয়টি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। পেশা সুত্রে তিনি একজন আইনের অধ্যাপক এবং মেরি গান বিশ্ববিদ্যালয়ের Empirical Legal studies Center এর সহকারী পরিচালক। ২০১২

সালের ২৯ আগস্ট তিনি Estimating Gender Disparities in Federal Criminal Cases নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপক স্টারের অনুসন্ধান মতে –

‘ফেডারেল ফৌজদারি মামলায় ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়, যার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই। নারীদের তুলনায় পুরুষরা গড়ে ৬৩% বেশি দীর্ঘমেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত হন। এছাড়াও পুরুষদের চেয়ে নারীদের ক্ষেত্রে অভিযোগ ও সাজা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। তারা দোষী হিসেবে প্রমাণিত হলেও কারাবরণ এড়িয়ে যাওয়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা রয়েছে।’

অস্ট্রেলিয়ার আইন গবেষকরা একই কথা বলেছেন। ডাক্তার সামান্থা জেফ্রিস ও ক্রিস্টিন ই ডাব্লিউ বন্ড ২০১০ সালে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অপরাধ পরিসংখ্যান ও গবেষণা দফতরের সহায়তায় পিয়ার রিভিউড জার্নাল ‘কারেন্ট ইস্যুজ ইন ক্রিমিনাল জাস্টিস’- এ একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তাদের গবেষণা অনুযায়ী - ‘সরকারি তথ্যমতে, নারীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পুরুষের কৃত একই অপরাধের চেয়ে কম গুরুতর বিবেচনা করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষ এই জাতীয় চিন্তা চেতনা অনুপস্থিত থাকলেও নারীদের সাজা পুরুষদের চেয়ে কমই হয়ে থাকে। আবার লিঙ্গ ও সাজার তারতম্যের মধ্যেও একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ আদালতে যখন নারী ও পুরুষরা একই অপরাধের জন্য হাজির হয়, নারীদের জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারাবরণ করলেও সেটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য।’

অবশ্য ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এই যে লিঙ্গ বৈষম্য, এক্ষেত্রে কিন্তু ফেমিনিস্টদের হইচই শুনবেন না। সবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খসড়ার দিকে লক্ষ করা যাক। আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ বছর বয়স্ক একজন পুরুষ হয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনাকে মিলিটারি সার্ভিসের জন্য নিবন্ধিত হতে হবে। তা না করলে আপনি ভোট দিতে পারবেন না, কলেজের জন্য আর্থিক সাহায্য পাবেন না অথবা কোন ফেডারেল সংস্থা তে চাকরি ও পাবেন না। কিন্তু এখন পর্যন্ত মিলিটারি সার্ভিসে নারীদের নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই। কলেজের আর্থিক সাহায্য সহ ওপরের সব সুবিধা তারা বিনা সার্ভিসেই পাবে। এরপরও যখন কোন নারীবাদী নাকের জল আর চোখের জল একাকার করে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে – নারীরা কতটা নিগৃহীত, বুঝে নেবেন – তারা ডাहा মিথ্যা কথা বলছে।

নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর

নারীবাদের প্রধান দুই শত্রু হলো বিবাহপ্রথা ও পারিবারিক মূল্যবোধ। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীবাদীরা এই দুটিকেই ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছে। ধ্বংসাত্মক ফেমিনিস্টরা পুরুষ ও সমাজের কাঁধে দোষ চাপিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, পুরুষ দমনের সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালায়। কিন্তু ফেমিনিজম খোদ নারীদের ওপর কী প্রভাব ফেলে, তা নিয়েও আলোচনা করা জরুরি।

দীর্ঘ সময় পর হলেও নারীরা ফেমিনিস্টদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম বুঝতে শুরু করেছে। বিয়ে প্রথাকে আক্রমণ করার সময় থেকেই ফেমিনিস্টরা জানত, নারীদের সুখি এবং ভালোবাসাপূর্ণ পারিবারিক জীবন থেকে বের করে আনতে হলে অবশ্যই সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে দিতে হবে। ফলে তারা ক্ষনিকের সুখ লাভের জন্য উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের সুবিধাসমূহ প্রচার করতে শুরু করে। উচ্ছৃঙ্খলতার ‘কুফল’ রোধকল্পে সমানতালে চলতে থাকে জন্মনিরোধক আর ঢালাও গর্ভপাতের প্রচারণা। অথচ বাস্তব জীবনে যত্রতত্র গর্ভধারণ এবং লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম ভয়াবহ এবং গুরুতর।

সহজ কথায়- নারীবাদীরা জন্মনিরোধক ও গর্ভপাতের মাধ্যমে কুকর্মের প্রাকৃতিক পরিণতি এড়ানোর টোপ দিয়ে নারীদের যথেষ্টা ও যত্রতত্র শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে প্রলুব্ধ করেছিল। এই পরিকল্পনার অভ্যন্তরেই বেশ্যাবৃত্তিকে বলা হয়েছে লিঙ্গবৈষম্যমূলক আর অবাধ যৌনাচারকে দেওয়া হয়েছে শারীরিক স্বাধীনতার তকমা। অদূরদর্শী নারীবাদীরা কখনোই উচ্ছৃঙ্খলতার বিনিময়ে বিয়ে ও পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিণতি বিবেচনা করেনি।

এদিকে সমাজে বাধাহীন বিশৃঙ্খলার প্রভাবে বিভিন্ন অপরাধ এবং মাদকাসক্তি বেড়ে যায়। সমাজ ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে জ্যান্ত নরকে। এগুলো কি বিশেষ কোনো পরিণতি বয়ে আনবে? চলুন সেটাই আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই কথা বলি জন্মনিরোধক নিয়ে। আজকাল জন্মনিরোধক পিল এতটাই সহজলভ্য যে গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা ছাড়াও বিভিন্ন উদ্দেশ্য এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে ডাক্তাররা ব্রণ প্রতিরোধে, অনিয়মিত মাসিক, এমনকি মাসিকের পূর্বের লক্ষণসমূহের কারণেও এসব

পিলের প্রেসক্রিপশন দিয়ে দেন। যদিও সাধারণভাবে জন্মনিরোধক পিল নিরাপদ, কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম নয়। যেকোনো সময় এটি ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

জন্মনিরোধকের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হলো স্থূলতা। এটা সেবনের ফলে ওজন বেড়ে যায়। কিন্তু বিষয়টাকে বরাবরই লঘু বিবেচনায় এড়িয়ে যাওয়া হয়। এমনকি অনেক বিশেষজ্ঞও একে সমস্যা বলে মনে করে না। তাহলে আমরা কেন এই বিষয়ে কথা বলছি? কারণ, গবেষণায় স্থূলতার পরিবর্তে কেবল সলিড মাস গেইন (গণকল্যাণ) পরিমাপ করা হয়। সেলফ ম্যাগাজিনের জাহরা বার্নস একবার The Truth About Birth Control Causing Weight Gain নামে ডাক্তার ইদ্রিস আবদুর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট। ডাক্তার আবদুর রহমানের ভাষ্যমতে- ‘সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, এটা ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম।’ এ ছাড়া মাউন্ট সিনাই স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর অ্যালিসা ডেক বার্নসকে বলেন- ‘আপনার অবশ্যই অতিমাত্রায় ওজন বৃদ্ধি করা উচিত নয়।’

২০১৪ সালের ২ জানুয়ারি কোচরান ডেটাবেজ অফ সিস্টেম্যাটিক রিভিউ - এ প্রকাশিত একটি মেটা স্ট্যাডিতে আরও বলা হয়-

‘বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ওপর পরিচালিত গবেষণায় ওজন বৃদ্ধির বিষয়টি মোটামুটি একই রকম। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কারণে ওজন বৃদ্ধি পায় না - এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণ মেলেনি।’

নারী স্বাস্থ্য জার্নালিস্ট আলেক্সান্দ্রিয়া গোমেজ একবার ইয়েল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর মেরি জেন মিনকিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তিনি বলেছিলেন - আজকাল স্থূলতা একটি কমন অভিযোগ। সমস্যা হলো- হরমোনাল জন্মনিরোধক গুলো কেন আপনাকে মোটা বানিয়ে ফেলবে, তা এখনও একটি রহস্য।

ডক্টর মিনকিন নিশ্চিত করেন- হরমোনাল জন্মনিরোধক গুলো কেন ওজন বৃদ্ধি করে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের তেমন কোনো ধারণাই নেই। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, এগুলো ওজন বৃদ্ধিতে সক্ষম। দুঃখজনক ব্যাপার হলো - সবাই বিষয়টি জানা সত্ত্বেও এ প্রসঙ্গে কথা উঠলে

আলোচনা অন্যদিকে নিয়ে যায় এবং মূল সংকটটাই ধামাচাপা দিয়ে ফেলে। অথচ এটি একই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত।

ডক্টর জয়শ্রী কুলকার্নি অস্ট্রেলিয়ার আলফ্রেড অ্যান্ড মনাশ ইউনিভার্সিটির একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি শুধু একজন অধ্যাপকই নন; মনাশ আলফ্রেড সাইকিয়াট্রি রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টরও বটে। এটি বিভিন্ন সেক্টরের ১০০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ মনোরোগ গবেষণাকেন্দ্র। ডক্টর কুলকার্নি পিয়ার রিভিউড জার্নাল এক্সপার্ট অপিনিয়ন অন ড্রাগ সেইফটি তে ২০০৬ সালের জুলাই সংস্করণে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তার অনুসন্ধান বেরিয়ে আসে –

‘বিশ্বব্যাপী লক্ষাধিক নারী কার্যকর জন্মনিরোধক হিসেবে মুখে সেবনযোগ্য গর্ভনিরোধক পিল ব্যবহার করেছেন। এখনও পর্যন্ত এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কেবল শারীরিক দিককেই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। অথচ এটি ব্যবহারের অধারাবাহিকতার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে ডিপ্রেসন বা হতাশার কথা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে – হতাশার কারণ হিসেবে ওরাল গর্ভনিরোধক পিলের ভূমিকার ব্যাপারে গবেষণা রয়েছে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি। একটি পাইলট গবেষণা প্রকল্প দেখিয়েছে যে, ওরাল গর্ভনিরোধক পিল সেবনকারী নারীরা সাধারণ নারীদের চাইতে উল্লেখযোগ্যমাত্রায় অধিক হতাশাগ্রস্ত ছিলেন।’

২০১৬ সালে অ্যামেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পিয়ার রিভিউড জার্নাল JAMA PSzchiatry হতাশার সাথে হরমোনাল জন্মনিরোধকের সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করে। এটি মূলত শার্লট ওয়েসেল, স্কোভলুন্ড এমএসসি, ডক্টর লিনা স্টেইনরড মর্চ এবং ডক্টর লার্স ভেদেল কেসিংয়ের পরিচালিত একটি যৌথ গবেষণা উদ্যোগ। গবেষণাটিতে এই ভয়ংকর তথ্য উঠে আসে –

‘সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নারী হরমোনাল জন্মনিরোধক ব্যবহার করছেন। কিছু নারীর মন মেজাজ নিয়ন্ত্রণে এসব ওষুধের প্রভাব থাকার ক্লিনিক্যাল প্রমাণ মেলা সত্ত্বেও হরমোনাল গর্ভ নিরোধকের সাথে মানসিক অস্থিরতার সংযোগ যথায় যথায় গুরুত্বের সাথে চিহ্নিত করা হয়নি। দেশব্যাপী এক মিলিয়নেরও বেশি নারীর ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের হরমোনাল জন্মনিরোধক সেবনকারীদের মধ্যে হতাশানিরোধক পিল ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি রয়েছে। প্রথমবার অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ব্যবহার করছেন – এমন অনেকেই জন্মনিরোধক সেবী। এই হার কিশোরীদের মধ্যে সর্বাধিক।’

বিজ্ঞান এখানে সুস্পষ্ট। হরমোনাল জন্মনিরোধক নিঃসন্দেহে মানসিক স্বাস্থ্যে সমস্যার সাথে জড়িত। তবে এখানেই এর শেষ নয়। গবেষণায় পাওয়া যায়, জন্মনিরোধক সেবনের ফলে নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেড়ে যেতে পারে। The Susan Komen Foundation স্তন ক্যান্সারের অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটিকেও একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এভাবে –

‘সাম্প্রতিক সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলের ব্যবহার জন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি কোনদিকেন নারীরা গর্জনিরোধক পিল সেবন করেন, তার হন ব্যানসারের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২০-৩০ শতাংশ বেশি।’

যদিও ফেমিনিস্টরা গণহারে নারীদের জন্মনিরোধক ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করছে, এর ভয়াবহ পরিণতি যে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি, সেটা একবারও বলছেন না; বরং প্রতিনিয়ত এসব বাস্তব তথ্যকে তারা ছোটো করে দেখায় এবং অগ্রাহ্য করে। কেননা, এসব বাস্তব তথ্যাবলি তাদের বক্তব্যকে ধসিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এবার গর্ভপাতের কুফলের ওপর আলোকপাত করা যাক।

দীর্ঘ সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব মেডিকেল বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, গর্ভপাতের সাথে ক্রমবর্ধমান ক্যান্সারের সম্পর্ক নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিষয়টি একেবারেই ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। মানবদেহে ক্যান্সারবিষয়ক আন্তর্জাতিক পিয়ার রিভিউড জার্নাল Cancer Causes and & Control-এর ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংস্করণ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে A Meta-Analysis of the Association Between Induced Abortion and Breast Cancer Among Chinese Females শিরোনামে। গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন জাতীয়ভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন সংস্থার ১৩ জন বিশেষজ্ঞ মিলে। বুঝতেই পারছেন, এই গবেষণা কিছু নির্বোধ ব্যক্তির ঘরে বসে সম্পন্ন করেনি। এটি চীনের অনেকগুলো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত একটি গবেষণা। তাদের প্রাপ্ত ফলাফলও ছিল ভয়ংকর। তারা উপসংহার টেনেছেন এভাবে-

‘চাইনিজ নারীদের মধ্যে অহেতুক গর্ভপাতের সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পৃক্ত। স্বতঃপ্রণোদিত গর্ভপাতের (Induced Abortion) সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্তন ক্যান্সারের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।’

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চীনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ক্যানসার চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোর ১২ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞের মতানুসারে-একজন নারী যত বেশি মাত্রায় গর্ভপাত ঘটায়, স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি তত বেড়ে যায়। উপরন্তু ২০১৫ সালের ৭ এপ্রিল আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ কলেজ Know Your ABC: The Abortion Breast Cancer Link নামে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে বলা হয়-

'আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ কলেজ নারীদের প্রাথমিক বিষয়গুলো জানার আহ্বান জানাচ্ছে। স্তন ক্যানসারের সাথে গর্ভপাত সম্পর্কিত। যদিও মেডিকোল কমিউনিটি এই সম্পর্ক মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে। ফুল টার্ম ডেলিভারির পূর্বে এবং গর্ভধারণের ৩২ সপ্তাহের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত গর্ভপাত একজন নারীর স্তন ক্যানসার আক্রান্তের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। বিশেষত কিশোরীদের জন্য এই ঝুঁকি আরও বেশি।'

পরবর্তী সময়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে সিয়াটল শিশু হাসপাতালের ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডক্টর রেবেকা জনসনের সম্পাদিত একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করা হয়। তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন-

'প্রমাণিত তথ্য-উপাত্ত এই ইঙ্গিত দেয় যে, পূর্ণকালীন গর্ভধারণের পূর্বে গর্ভপাতের কারণে বিশ্বজুড়ে ক্যানসারের হার উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। বর্তমান গবেষণা অকালে গর্ভপাত এবং স্তন ক্যানসারের মধ্যে জোরালো সংযোগ প্রদর্শন করছে। একটির কারণে আরেকটির ওপর প্রভাব পড়ছে। যদিও আরও অনেক গবেষণা হবে, কিন্তু কিশোরীদের এখন এই ঝুঁকি সম্পর্কে জানাটা জরুরি। সকল কিশোরী এবং তাদের পিতা-মাতার স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ কলেজ সুপারিশ করছে-সব মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা যেন এই তথ্য ছড়িয়ে দেন। কন্যাদের এই তথ্য বাবা-মায়ের বিশদভাবে বলা উচিত। সমস্ত স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষকদের উচিত যে, কোনো স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্লাসে এই তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা।'

এরচেয়ে ভয়ংকর কিছু আর হতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির ফলে জন্মনিরোধকের ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে গর্ভপাত বেড়ে যাচ্ছে। এবং উভয়টিই নারীদের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা আরও অনেক উপায়ে নারীদের ক্ষতিসাধন করছে। ডক্টর ক্রিস ইলিয়েডস ২০১০ সালের ১৫ জুনে এভরিডে হেলথে লেখেন-'আপনার যৌনসঙ্গীর সংখ্যা যত বেশি; এইডস, প্রস্টেট ক্যানসার, জরায়ু ক্যানসার ও ওরাল ক্যানসারের মতো যৌনবাহিত জীবনসংহারী রোগের ঝুঁকিও তত বেশি।'

তিনি আরও বলেন- 'উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলোর একটি। এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে অত্যধিক মদ্যপান, জুয়া, অন্যান্য রোমাঞ্চকর আচরণ যেমন: দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলোকে।'

তবে এই বিষয়টি ২০ বছর পূর্বেই জানা গিয়েছিল, যখন ১৯৯২ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগ 'নারী কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাধিক যৌনসঙ্গী বাছাই যৌন রোগের ঝুঁকির কারণ' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকাশ করেছিল। সেই গবেষণায় বলা হয়েছিল-

'একাধিক যৌনসঙ্গী বাছাই যৌন রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়া ইতঃপূর্বে চিকিৎসাধীন ব্যক্তির বাইরে কারও ওপর যাচাই করা হয়নি। যৌনসঙ্গীর সংখ্যা এবং যৌনবাহিত রোগে সংক্রমিত হওয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে। যেসব নারীর যৌনসঙ্গী একজন, তাদের চেয়ে যেসব নারীর পাঁচ বা ততোধিক যৌনসঙ্গী আছে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যৌন রোগের সম্ভাবনা আট গুণ বেশি। অধিকহারে যৌনসঙ্গী বাছাই এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যৌনসংগম বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌনবাহিত সংক্রামক রোগের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।'

আমরা জানি, আমেরিকাতে বয়স ২০ না পেরোতেই বহু নারী পাঁচজনেরও বেশি যৌনসঙ্গী বানিয়ে ফেলে। যৌন সংক্রামক রোগীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনক। ২০১৫ সালের ১৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে-

'২০০৬ সালের পর প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী যৌনবাহিত সংক্রামক রোগ ক্লামিডিয়া, গনোরিয়া ও সিস্টিলাস উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যৌন সংক্রামক রোগগুলো তীব্রভাবে আক্রান্ত করছে তরুণদের, বিশেষত নারীদের। নারীদের সংক্রমণ ২০১৪ সালে এই তিনটি রোগের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে মারাত্মক অবদান রেখেছিল।'

২০১৪ সালের উপাত্ত থেকে এটাও জানা যায়-তরুণদের মধ্যে এখনও যৌন সংক্রামক রোগ বিশেষ করে ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। যৌনসক্রিয় জনসংখ্যার তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র অংশ হওয়া সত্ত্বেও ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণরা ২০১৪ সালে সবচেয়ে বেশি হারে ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়াও পূর্ববর্তী

গবেষণাগুলো থেকে জানা যায়, প্রতি বছর যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত প্রায় ২০ মিলিয়ন রোগীর অর্ধেকই এসব কলেজপড়ুয়া তরুণ-তরুণী। সিডিসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধমূলক পরিষেবা টাস্ক ফোর্স ২৫ বছরের কম বয়সি যৌনসক্রিয় নারীদের বাৎসরিক রোগ ক্ল্যামিডিয়া ও গনোরিয়া পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অসংখ্য তরুণের রোগ পরীক্ষাই করা হয়ে ওঠে না। ফলে তারা জানেও না যে তারা আক্রান্ত।

বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির কল্যাণে এই তিনটি রোগই নিরাময়যোগ্য। তারপরও সিডিসি কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌন সংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান হার নিয়ে উদ্বেগ?

কারণ তারা জানে, যত বেশিসংখ্যক মানুষ যৌন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে, তত বেশি এইচআইভি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। সিডিসির বার্তা খুবই সুস্পষ্ট। একজন ব্যক্তির যত বেশি যৌনসঙ্গী থাকবে, তার যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ভুলে যাবেন না, সিডিসি ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই বলেছে-এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে নারীরা। কেন তারা বেশি অনিরাপদ?

২০০৮ সালের ৯ ডিসেম্বর পল সিমস ডেইলি মেইল-এ প্রকাশিত তার In the Age of Promiscuity, Women Have More Sexual Partners Than Men শীর্ষক কলামে সেই প্রশ্নের জবাব দেন। More Magazine-এর একটি গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন- 'গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, নারীরা দিনদিন অধিক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। পুরুষদের চেয়ে তাদের যৌনসঙ্গী অনেক বেশি।

২১ বছর বয়সের মধ্যে তারা গড়ে ৯ জন প্রেমিকের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়। এবং এক-চতুর্থাংশ নারী কুমারীত্ব হারানোর পর থেকে পাঁচ বছরে এক-পঞ্চমাংশ তরুণের তুলনায় ১০ জনেরও বেশি সঙ্গীর সাথে সংগম করে। এ ছাড়াও তরুণীদের বিশ্বাসঘাতক আচরণ করার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ। এর মধ্যে সঙ্গীর সাথে প্রতারণার কথা স্বীকার করে ৫০ শতাংশ। গবেষণাটি আরও খুঁজে পায়-অর্ধেক নারীই যাদের কাছে কুমারীত্ব হারিয়েছিল, তাদের প্রতি প্রেমের কোনো অনুভূতি ছিল না। প্রতি ১০ জনের মধ্যে সাতজনের ক্ষেত্রেই এটা ছিল নিছক ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড। প্রতি চারজনে একজন টাকার জন্য এবং ৩৯ শতাংশ নারী শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছিল পদোন্নতির জন্য।

এ ছাড়া ২৭ শতাংশ নারী বিবাহিত পুরুষের সাথে এবং ১৪ শতাংশ নারী তাদের বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্কে জড়ানোর কথা বলে। সুস্পষ্টভাবেই নারীবাদীদের অবাধ

যৌনাচার আন্দোলন এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। এখানেই এর শেষ নয়। মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাব অনস্বীকার্য। ডক্টর সুসান। ক্রাউস হুইটবার্ন সাইকোলজি টুডে-তে প্রকাশিত তার দুটি কলামে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রথম কলামটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের ৯ মার্চ, How Camal Sex Can Affect Our Mental Health শিরোনামে। তার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী-

'উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্কের বিস্তৃত এক গবেষণার পর কিনসে ইনস্টিটিউটের গবেষক জাস্টিন গার্সিয়া এবং তার দল সিদ্ধান্তে আসেন-অবাধ যৌন সম্পর্ক (Hookups) একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পালাবদলের অংশ, যা পশ্চিমা বিশ্বে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে। অবাধ যৌন সম্পর্ক মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব ফেলে। যেসব ব্যক্তি উদ্দেশ্যহীন শারীরিক সম্পর্কে জড়িত হয়, তাদের প্রত্যেককেই এর মানসিক পরিণাম ভোগ করতে হয়। এর প্রভাব শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের দীর্ঘদিন পরেও রয়ে যায়। যেসব গবেষক মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে অবাধ যৌনাচারের সংযোগের নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তারা আরও রিপোর্ট করেন- যেসব ব্যক্তি পূর্বে হতাশ ছিল না, উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পর তাদের মধ্যে অনেক বেশি হতাশার লক্ষণ এবং একাকিত্ব লক্ষ করা যায়। যারা যত বেশি অবাধ যৌনাচারে জড়িত, তাদের মানসিক যন্ত্রণা তত বেশি।'

সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাদকাসক্তি কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ড্রাগ ও অ্যালকোহল পুনর্বাসনকেন্দ্র তাদের alcoholrehab.com ওয়েবসাইটে খোলাখুলিভাবে এর উত্তর দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে- 'অ্যালকোহল ও ড্রাগ অপব্যবহারের ফলে অনেক সমস্যার সূত্রপাত হয়। এসব অপব্যবহারের অন্যতম আসন্ন বিপর্যয় ঘটবে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে। মানুষের পক্ষে মন পরিবর্তনকারী পদার্থের অপব্যবহার করে অটুট সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তি বেশি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে এটা সম্পূর্ণভাবে তার জীবন দখল করবে এবং তার জীবনে আর অন্য কারও জন্য জায়গা থাকবে না। কারণ, মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিভ্রম ও আচ্ছন্নতায় ডুবে থাকে। তারা যতদিন পর্যন্ত মাদক পরিহার না করবে, ততদিন এর কোনো পরিবর্তন অসম্ভব। এমনকি এখান থেকে আরোগ্যলাভের পরেও অন্তরঙ্গ এবং স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক উপভোগ করার সক্ষমতা ফিরে পেতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।'

এ বিষয়টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বেথ ওয়াটসন ২০১৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে 'উচ্ছৃঙ্খলতা কি আত্মহননের ভিন্ন রূপ?' নামে একটি ব্লগ পোস্ট লিখতে শুরু করেন। তার মতে, পিতৃহীন কন্যাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা এখন আত্মহননরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অন্য

বিশেষজ্ঞদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন- 'যে কন্যারা পিতৃহীনভাবে বেড়ে ওঠে, তাদের পক্ষে যৌন আচরণ এবং সমস্ত অসৎ জায়গায় বৈধতা খোঁজা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

পিতৃহীন কন্যাদের মধ্যে প্রায়ই সাধারণ চর্চা হিসেবে উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয় এবং এর সম্ভাব্য কারণ পিতার অভাব। ক্যাপিট্যাল প্রিপারেটরি ম্যাগনেট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর স্টিভ পেরিও পিতৃহীন কন্যাদের নিয়ে কাজ করার সময় একই বিষয় লক্ষ করেছেন। বলেছেন- 'উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রধান বিষয়। প্রায়শই আমরা যখন মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত তরুণীদের দিকে লক্ষ করি, তাদের স্ববিকৃতিকে বিদ্রূপপূর্ণ হিসেবেই চিন্তা করি। এটা সত্যিই বিদ্রূপপূর্ণ বটে, তবে স্ববিকৃতির আরেকটি অর্থ হলো-অন্য কাউকে আপনার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া।'

নারীবাদীরা তাদের লাগামহীন মিথ্যাচার প্রচারের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইছে-বিশৃঙ্খলতার অর্থ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। অবাধ যৌনাচার আন্দোলনকে ব্যবহার করে তারা ইতোমধ্যে বিবাহপ্রথা এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে একটি বিশৃঙ্খল সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটিয়েছে, যেটা সিডিসির মতে-যৌনব্যাপি সৃষ্টি এবং আশঙ্কাজনক হারে তা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্কের সপক্ষে ফেমিনিস্টদের দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্পেইন নারীদের ক্ষতিকর জন্মনিরোধক পিল সেবনে প্ররোচিত করছে, তৈরি করছে ক্রমবর্ধমান মানসিক সমস্যা। উপরন্তু গবেষকগণ বলছেন-একজন ব্যক্তির যত বেশি যৌনসঙ্গী রয়েছে, তার মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। সর্বোপরি জন্মনিরোধক এবং গর্ভপাত অবলম্বনের মাধ্যমে সৃষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা সন্দেহাতীতভাবে নারীদের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। যদিও ফেমিনিস্টরা এসব সংকটের পেছনে নিজেদের দায় অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের সেসব মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নারীবাদীদের সংগঠিত ও অর্থায়িত Slut Walks-এর কার্যক্রমের দিকে লক্ষ রাখাই যথেষ্ট। নারীবাদীরা যতই মিথ্যা বলুক না কেন, বাস্তবতা হলো-উচ্ছৃঙ্খলতার সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি রয়েছে।

নারী নেতৃত্ব

ক্ষমতাসীনদের সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত, বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর নয়।। নারীবাদীরা অভিযোগ করে যে নারীরা ক্ষমতায়ন এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে বলে নারীদের ক্ষমতায় যাওয়া উচিত। [৩] তাদের মতে, প্রশাসনে নারীর উত্থান এবং প্রবেশাধিকার বাড়ানো হলো 'সামাজিক ন্যায়বিচার' এর অংশ। যদি নারীরা ক্ষমতায় না যায় তবে নারীর ওপর ইচ্ছামতো আইনি নিষ্পেষণ চালু রেখে পুরুষতন্ত্র আজীবন টিকে থাকবে, তাদের আধিপত্য থেকে যাবে স্বমহিমায়। নারীবাদী ফসেট সোসাইটি (Fawcett Society) বলেছে, "ক্ষমতার শীর্ষ চূড়ায় নারী অনুপস্থিত [] যদি আপনি টেবিলে না থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই মেনুতে থাকতে হবে"।

এসব দাবি করার সময় নারীবাদীরা ভুলে যায় ক্ষমতার শীর্ষে পুরুষ থাকলে যদি নারীকে মেনুতে থাকতে হয়, তাহলে গুটিকয়েক সেসব ক্ষমতাস্বত্ব পুরুষ বাদে বাকি সব পুরুষকেও মেনুতেই থাকতে হয়। সব পুরুষ সমান নয়-তাদের মধ্যে বুদ্ধি, দায়িত্ব, শক্তি, সম্পদ, চেহারা এবং শ্রেণির পার্থক্য আছে। শুধু বিশেষ একটি অভিজাত শ্রেণিই নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পায়। ক্ষমতায় থাকা একটা ক্ষুদ্র অংশ সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতিনিধিত্ব করে এমন বলা যেমন হাস্যকর, ঠিক তেমনি ক্ষমতায় থাকা নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সকল নারীর প্রতিনিধিত্ব করবে বলে দাবি করাটাও একইভাবে হাস্যকর। তারা জুলুমতন্ত্র বদলাতে চায় না বরং এর মধ্যেই ফিট করতে চায়। অন্যায়-অপশাসনের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান না রেখে সে অপশাসনের প্রশাসনেই তারা একটি চেয়ার দাবি করে। নারীবাদীরা যদি তাদের ন্যায়বিচারের আস্থানে আন্তরিক হতো, তবে নারী জাতির মধ্যে এ শ্রেণি বৈষম্য নিজেরাই তৈরি করতে চাইত না। বরং সম্পূর্ণরূপে একটি বিকল্প ব্যবস্থার দাবি নিয়ে আসত।

নারীদের উপকারের জন্য যা করা উচিত তা না করে যা করা অনুচিত তাই করে নারীবাদীরা। নারীবাদীদের মৌলিক একটি দাবি হলো, পুরুষরা প্রতিনিয়ত নারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। কারণ হলো, তারা পুরুষ। নারীরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে।

কারণ তারা নারী। তাদের মতে, পুরুষই সমস্যা, বিপরীতে নারী হলো সমাধান নারীদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এ ধরনের সেক্সিস্ট অভিযোগ করা হলে নারীবাদীরা কি ক্ষুদ্র হতো না? উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নারী না থাকলেই যে পুরুষরা প্রতিটি সময় নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য

করে তা সর্বোচ্চ মিথ্যা। উদাহরণস্বরূপ এই বছরের শুরুর দিকে, 'Counting Women In' সংস্থা থেকে 'Sex and Power ২০১৩: Who runs Britain?' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয় 'ক্ষমতা থেকে নারীদের বাদ দেওয়া নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর'। হাইকোর্টের বিচারকদের মধ্যে যে মাত্র ১৫.৬% নারী তা নিয়ে এ রিপোর্টটিতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তবুও এ 'পুরুষ শাসিত' আদালতে একই অপরাধের জন্য একজন নারীর তুলনায় একজন পুরুষের বেশি শাস্তি হয়। সি প্রতিবেদনটিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মাত্র ১৪.২% নারী। অথচ HESA পরিসংখ্যান (Higher Education Statistics Agency) অনুসারে, ২০১০/১১ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। ডিগ্রি অর্জনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। প্রথম শ্রেণির ডিগ্রিদারী শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৫৭%। তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির এবং উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রিদারী নারী গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৬৬% যেখানে পুরুষ গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৬১%। তাও কিনা পুরুষতন্ত্রই নারীর অবনতির জন্য দায়ী।

নারী-মাত্রই কি ন্যায়বিচার করে? যদিও এটি খুবই অযৌক্তিক সেক্সিস্ট ধারণা, তাও যুক্তির খাতিরে একে সাময়িক মেনে নিয়ে বিনোদন নেওয়া যাক। রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, ইরাক, তিউনিসিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, দক্ষিণ সুদান এবং উগান্ডা-এরা প্রত্যেকে দরিদ্র রাষ্ট্র এবং নারীবাদীরা এসব দেশকে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংস হিসেবে দেখায়। অথচ সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের কথা বললে উল্লিখিত প্রতিটি দেশে সরকারি কাজে আমেরিকার চেয়ে বেশি নারী নিয়োজিত। রুয়ান্ডায় পার্লামেন্টে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। তবুও রুয়ান্ডার জনসংখ্যার ৪৫% দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। রুয়ান্ডার নারী

উন্নয়ন মন্ত্রী একজন নারীবাদী কর্মী। তিনি গণহত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি সেনাবাহিনী কর্তৃক বর্বরভাবে হাজার হাজার উন্মত্তকে হত্যার পুরস্কার হিসেবে তাদের নারীদেরকে ধর্ষণ করতে বলেছিলেন। সুতরাং একজন নারী ক্ষমতায় যাওয়া যেখানে ন্যূনতম মানবতা নিশ্চিত করারই সামান্যতম গ্যারান্টি দেয় না, সেখানে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা তো বহু দূরের ব্যাপার। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে একইভাবে নারী শাসক ছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতায় থাকা উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারীদের পদবি ভারী করা ছাড়া সাধারণ নারী-পুরুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। আদতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পার্লামেন্টে নারীসংখ্যা বৃদ্ধি এ দুয়ের মধ্যে স্পষ্টভাবেই কোনো সম্পর্ক নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার থাকা সত্ত্বেও (৫৩%) পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যায় আমেরিকা এ দেশগুলোর পিছিয়ে ছিল।'। অবাক করা বিষয় হলো, নারীরা নারীকে নির্বাচন না করে 'ভুল লিঙ্গ' অর্থাৎ একজন পুরুষ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করছে। এ ক্ষেত্রে নারীবাদীদের উচিত ছিল নারীদের পছন্দকে সম্মান করা। কিন্তু তারা তা না করে নারী ভোটারদেরকেই দোষারোপ করতে থাকে। এরাই পার্লামেন্টে আবার সংরক্ষিত মহিলা কোটার কথা বলে।

ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য নারীর ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। নারী ক্ষমতায়ন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না।

প্রশাসনে নারী অবস্থান আন্দোলন জুলুমতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে

নারীবাদীরা দাবি করে যে নারী ক্ষমতায় যাওয়ার মানেই হলো নারীর অধিকার নিশ্চিত করা, সুযোগ বৃদ্ধি করা। বাস্তবে নারীদের ইচ্ছার কোনো পাত্রই নেই তাদের কাছে। তারা নিজেদের মতো কিছু আইন বানায়, এরপর তা প্রকাশ করে দাবি করে যে এগুলোই আসলে নারীর জন্য ভালো, আর কিছুই ভালো না। সব সেক্সিস্ট। জুলুমতন্ত্র, পুঁজিবাদের এ যুগে পুরুষরা যেসব নিপীড়ন ভোগ করে তারা চায় নারীরাও তাই ভোগ করুক। এটাই নাকি সম্মান। যদি জ্যাক পাহাড়ের নিচে পড়ে যায় তবে কি জিলকেও পরে যেতে হবে?

নারীবাদীরা দাবি করে নারীরা ক্ষমতার নতুন সংজ্ঞা দেবে। ২০১৩ তে ফোর্বস কর্তৃক বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান একশজন নারীর নামের তালিকা প্রকাশকালে ফোর্বস এর মহিলা সম্পাদক বলেন, তিনি পুরোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সংজ্ঞায়নে নয়; বরং ক্ষমতার নতুন চিন্তা লালনকারী নারীদের নির্বাচন করতে চেয়েছেন। তার তথাকথিত 'নতুন' তালিকাটিতে ছিল প্রায় ৯জন রাষ্ট্রপ্রধান যাদের সম্মিলিত জিডিপি ১১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার, ২৪ জন সিইও যারা ৮৯৩ বিলিয়ন ডলার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ১৪ জন বিলিয়নিয়ার যাদের কাছে ৮২ বিলিয়ন ডলারের বেশি টাকা আছে। বিয়ন্স (১৭), অ্যাঞ্জেলিনা জোলি (#৩৭), এবং সোফিয়া ভার্গারা (#৩৮) সবাই ইংল্যান্ডের রানির (#৪০) আগে ছিলেন; কিন্তু সবার সামনে ছিলেন মিশেল ওবামা (#৪)। কেননা তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান পুরুষ বারাক ওবামার স্ত্রী। আসলে নারীবাদীদের ক্ষমতার এ নতুন সংজ্ঞা কোনোদিক থেকেই পুরুষতন্ত্রের চেয়ে ভিন্ন নয়।

নারীবাদীরা প্রকৃত পরিবর্তন চায় না, বরং দীর্ঘদিন যাবৎ যার দায়ে তারা পুরুষদেরকে অভিযুক্ত করে আসছে ক্ষমতা আত্মসাৎ করে ঠিক একই নিপীড়নমূলক নিয়ম সবার ওপরে চাপিয়ে দিতে চায়।

নারীবাদীরা দাবি করেন, পুরুষশাসিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রেখেছে, তাদেরকে পুরুষদের ওপর নির্ভর হতে বাধ্য করেছে (কারণ পুরুষরা স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে পছন্দ করে)। নারীবাদীরা মনে করে, পুঁজিবাদ তাদের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে রেখে দিয়েছে পুরুষকে। বাস্তবে পুঁজিবাদ পুরুষের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে রেখেছে চাকরিকে। পুঁজিবাদ বলতে নারীর ওপর পুরুষের নিপীড়ন বোঝায় না, বোঝায় দরিদ্রের ওপর ধনীর শোষণ। সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়ানো এবং লাখ লাখ পুরুষকে দেউলিয়া করে ছাড়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার বদলে নারীবাদীরা নারীকেও দেউলিয়া বানাতে চায়। তারা ঘরের বাইরে নারীকে কাজ করতে বাধ্য করেছে, নারীকে শালীনতা বিসর্জন দিয়ে শোষণের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান করেছে। ফলে ক্ষমতাবান অভিজাতরা খুব ভালোভাবে নারীকে বিনা বাধায় শোষণ করতে পারবে, দাস বানাতে পারবে এবং তাদের ওপরও ট্যাক্স বসাতে পারবে। উন্নয়ন।

নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ এবং নারীবাদ দুই আদর্শই পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করতে, Divide & Rule করতে সর্ববিস্তার একাট্রা। নারীবাদী আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলার অন্যতম কারিগর সিমন ডি বোভোয়ার (যার বই অনুবাদ করে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' নামে প্রকাশ করেছেন হুমায়ূন আজাদ) বলেছেন, “কোনো নারীরই সন্তান লালনপালনের জন্য ঘরে থাকা উচিত নয়, ইচ্ছা করলেও নারীদের এমনটি করা উচিত নয়। স্বেচ্ছায় এমন পছন্দের উদাহরণ তৈরি হলে অনেক নারীই এমনটা বেছে নেবে। এভাবে নারীকে ভুল পথে টেনে নেওয়া হয়”।

বোঝাই যাচ্ছে, নারীর সহজাত চাওয়ার কোনো মূল্য নেই নারীবাদীদের কাছে। নারীবাদ আসলে একটি বিশ্বাস, একটি ওয়ার্ল্ডভিউ। এটিই তারা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় নারীদের ভালোত্বের মুখোশে।

নেতৃত্বে অল্পকিছু পুরুষের প্রভাব এবং আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নারীবাদীরা অভিযোগ করে অথচ এ সত্যটি কখনোই উল্লেখ করে না যে প্রায় প্রতিটি পুরুষকে গড়ে তোলেন একজন নারী। একজন শিশুর বেড়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিঃসন্দেহে

তার 'মা'। প্রত্যেক তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক পুরুষই কোনো না কোনো নারীর স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা এবং আদর্শেই প্রতিপালিত হয়েছেন। নারীবাদীরা নিজেদের অধিকারের দাবিতে সবসময় সোচ্চার, কিন্তু দায়িত্বের কথা আসলে কেন চুপ হয়ে যান তারা? একজন নারীর কাছে সন্তান লালনপালন করার চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কী হতে পারে? পরবর্তী প্রজন্মকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেয়ে মৌলিক কাজ আর কি হতে পারে? পরম যত্ন দিয়ে চোখের সামনে তাদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলা এবং নিজের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া সন্তানদের ভালো মন্দের বিচার করতে দেখা-এর চেয়ে প্রশান্তির আর কি হতে পারে? ইসলামে একজন স্ত্রীকে ঘরের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অথচ কজন পুরুষের কাজের জায়গায় তাদের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকে? নারীবাদীরা এটিকে উপেক্ষা করে কেননা এটি স্বীকার করলে অকপটে স্বীকার করতে হবে যে নারীরাই মোটের ওপর ক্ষমতাশীল। সম্ভবত পুরুষের চেয়েও বেশি। সেইসাথে এটাকেও স্বীকার করতে হবে যে প্রকৃত ক্ষমতা মানে একনায়কতন্ত্র নয়, বরং ক্ষমতা মানে দায়িত্বশীলতা।

মায়ের দায়িত্ব থেকে নারীদেরকে পুরোপুরি বের করে আনা শুধু যে নারীদেরকেই বঞ্চিত করছে তা নয়, বরং চাইল্ডকেয়ার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারকেও সুযোগ করে দিচ্ছে বাচ্চাদেরকে সরকারের পছন্দমতো বানিয়ে নিতে। বাচ্চারা এভাবে কম বয়সেই বাইরের শিক্ষায় লালিত হয়। এমন ধরনের সিস্টেমে নারীদের ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো দরকার নেই, যে সিস্টেমে জুলুমতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

ক্ষমতা অধিকার নয়, দায়িত্ব

নারীবাদী এবং পশ্চিমা চিন্তায় ক্ষমতার সংজ্ঞায়নেই মূলত ভুলটা হয়ে যায়। অবশ্য ভোগবাদী এসব আদর্শে এর চেয়ে বেশি কিছু আশাও করা যায় না। ক্ষমতা কোনো সুযোগ নয়, এটি একটি বোঝা। ক্ষমতা মানে দায়িত্ব, অধিকার নয়। ক্ষমতা সবসময় দুর্নীতির দিকে টানে এবং ক্ষমতায় যারা থাকেন তাদেরকে সবসময় সংযম চর্চা করতে হয়। ক্ষমতা আরোপ করার বিষয়, চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়। একজন সুশাসক সকল জনতার জন্য চিন্তা করেন, তাদের সবার অধিকার রক্ষায় দিনরাত কষ্ট করেন, নির্দিষ্ট কোনো দলের বা গ্রুপের স্বার্থ নয়। একটি সুশাসনে একজন নেতা নিজের ইচ্ছামতো শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে না। তাকে নিম্নস্ত আইন অনুসারে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালার উৎস শারিআহ-যার মর্যাদা সবার আগে। এ নীতিমালা নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। রাষ্ট্র 'কে' পরিচালনা করছে তার কোনো প্রভাব জনগণের ওপর পড়ে না বরং নেতাকে তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। যে ক্ষমতা পাওয়ার আবেদন করে সে ইতিমধ্যেই ক্ষমতা পাওয়ার অযোগ্য। একজন নেতা শাসন নয়, সেবা করতে বাধ্য। আর এটিই ইসলামে ক্ষমতা বা নেতৃত্বের ধারণা।

ইসলামে রাজনীতি এবং সরকারে নারী অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে তা ইসলাম যতটুকু অধিকার দিয়েছে ততটুকুই। হাদিস ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে একজন নারী অভিজ্ঞ হতে পারেন, মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং বিচারকার্যে অবদান রাখতে পারেন। নারী-পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় অন্যায়ে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে ম্যাণ্ডেট দেওয়া বা আনুগত্য প্রদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান। যদি কোনো হারবি কাফিরকে কোনো নারী আশ্রয় দেয়, সে ক্ষেত্রে খলিফাকে নারীর বিবেচনার ওপর আস্থা রেখেই তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হয়, সুরক্ষা দিতে হয়।

ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার 'অধিকার' নারী-পুরুষ কাউকেই দেওয়া হয়নি। পুরুষকে এ 'দায়িত্ব' দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নারীকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমান বিশ্ব নেতাদের মতো কোনো অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা কিংবা ভাতা পান না। জনসেবায় নিয়োজিত না থাকলে তিনি যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেন সে অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাঁকে দেওয়া হয়। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের সকল জনগণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, প্রতিটি নাগরিকের অধিকারের ব্যাপারে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়। নেতৃত্বের ব্যাপারটি অনেকটাই বাধ্যতামূলক সামরিক ড্রাফটিং এর মতো। কিন্তু

সেখানে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। দেশরক্ষার দায়িত্ব শুধু পুরুষকেই দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে।

নারীরা যদি সত্যিই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারের বাস্তবায়ন চায় তাহলে নারীবাদীদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ এসব জগাখিচুরি বক্তব্যে তাদের বিভ্রান্ত হলে চলবে না। এভাবে চলতে থাকে পুরোনো সাইকেল, অবস্থার কোনো পরিবর্তন আসে না। একজন নারীর উচিত আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য পালন করা। আল্লাহপ্রদত্ত আইন বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত করা। যে আইন ক্ষমতায়নের চেয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে বেশি গুরুত্ব নেয়। যে আদর্শের নারী-পুরুষ এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে দারিদ্র্য, শোষণ এবং নিপীড়ন থেকে রক্ষার ঐতিহাসিক খ্যাতি রয়েছে। প্রগতিপ্রদত্ত মূল্যবোধ মেনে নেওয়া ছাড়া মানবজাতি অন্য কিছুতেই ন্যায়বিচার পাবে না। নারী ক্ষমতায় গেলেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে না, নারী ক্ষমতায় গেলে জুলুনতন্ত্র পরিবর্তন হয় না। আর ক্ষমতায় যাওয়া কারও 'অধিকার' নয়। ক্ষমতা শুধু আল্লাহর, মানুষ কেবল তাঁর দেওয়া দায়িত্বই পালন করে।

পুরুষদের প্রতি জাতিগত ঘৃণা কি অবিচারের সমাধান?

নারীবাদীরা ধরে নিয়েছে পুরুষরাই কেবল ‘নিপীড়ক’, নারীরাই কেবল ‘নিপীড়িত’ এবং নিপীড়ক শ্রেণির অনুকরণ করাই হলো সমাধান। কাল্পনিক বা বাস্তব জাতিগত ঘৃণা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নয়। নির্যাতিতরাই যে একসময় তাদের সাথে হওয়া একই নির্যাতন করে, ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশি করে নিপীড়ক শ্রেণি হয়ে যায় তার উদাহরণ পৃথিবীতে অনেক।

ব্রাজিলিয়ান দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রিয়ারের মতে, ‘নির্যাতিতরা নির্যাতন থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে নিজেরাই নির্যাতনকারী হয়ে উঠতে চায়। তারা পুরুষদের সবকিছুকেই সফলতা বলে মনে করে, আবার তাদের দৃষ্টিতে পুরুষরাই নিপীড়ক। এর মানে কি?’

১৪শ শতকের মুসলিম দার্শনিক ইবনে খালদুনও এ বিষয়টি লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, এ ধরনের অনুকরণ আসলে নির্যাতনকারীর শ্রেষ্ঠত্বকেই আরও বেশি করে তুলে ধরে। যে নির্যাতন করবে সেই শ্রেষ্ঠ-এমন একটি ধারণা শক্তিশালী হয়।

‘পরাজিতরা সবসময় তাদের বিজয়ীদের পোশাক, আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং আচারের অনুসরণ করতে চায়। মানুষ যাদের দাস হয়ে থাকে, যাদের কাছে পরাজিত হয় তাদেরকেই সফল এবং শ্রেষ্ঠ মনে করে।।। হয়তো বিজয়ীর প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধার কারণে তারা বিজয়ীকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অথবা পরাজয়ের কারণ হিসেবে তারা নিজেদের দোষ দেখে না, মনে করে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ বলেই তারা পরাজিত হয়েছে। তারা মনে করে না কোনো সাধারণ শক্তির কাছে তাদের পরাজয় হতে পারে। এ বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়ভাবে চেপে বসতে পারলেই হলো, এটা সকল দায়মুক্তির টনিক হয়ে যায়। এভাবে বিজয়ীর সাথে মিশে যাওয়ার প্রবণতা, তাদের সবকিছু অনুসরণ করার প্রবণতা ও তাদের একজন হয়ে ওঠার প্রবণতা বাড়তে থাকে। এমন মানসিক দাসত্ব অজ্ঞাতেই মানুষের মনে চলে আসে। আবার এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসও মাথায় চেপে বসতে পারে যে, বিজয়ীর বিজয়ের কারণ তার শক্তি, সক্ষমতা নয়; বরং তার বিশ্বাস, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি। নিজেদের ‘নিম্ন’ সংস্কৃতি থেকে বের না হলে বিজয় অর্জন সম্ভব না। মানুষ মনে করতে থাকে, বিজয়ীর অনুসরণ করেই তারা একদিন বিজয়ী হয়ে উঠবে।’

অনেকের মনে হতে পারে, 'আরে! এ যুক্তি দিয়ে নারী মুক্তির সকল রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নারীরা কি নিজেদের মুক্তির জন্য কোনো ব্যবস্থা নেবে না?'

অবশ্যই নেবে। কুরআন -হাদিস ও হাজার বছর আগের আলেমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভেঙ্গে ভেঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কোন জুলুম থেকে কীভাবে মুক্তি মিলবে। ইসলাম ভুলকে ভুল হিসেবে দেখে, জুলুমকে জুলুম হিসেবে দেখে; কে করল তা কোনো বিষয় না, কার সাথে হয়েছে তাও না। কোনো রাগ বা অসন্তুষ্টি ছাড়াই দমন হয় সব প্রকার অনাচার।

'হে মুমিনগণ, 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' [আল কোরআন ৫:৮]

'হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিভ্রাট হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত।' [আল কোরআন, ৪:১৩৫]

নিপীড়ক গোষ্ঠীর একজন হওয়া নির্বিচারে যা ইচ্ছা তাই করার লাইসেন্স না, কোনো শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠিও না।

বিদায় হজের ভাষণে রাসুল ﷺ বলেন-

'কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো কালোর ওপর কোনো সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

একই বাক্যেই রাসুল ﷺ বিপরীতটাও বলেছেন-

'কোনো অনারবের কোনো আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোনো সাদার ওপরে।' তিনি ঠিক করে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড, 'তাকওয়া ও সৎ কাজ।'

'নির্যাতিত' জাতির অংশ হওয়ার কারণে কেউ দায়মুক্ত হয়ে যায় না। অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর দায়িত্ব থেকেই যায়। পরিবার, সমাজ ও সুবিচারের জন্য তবি অনেক কিছু করার আছে। আল্লাহ তাঁর কিতাবে হাশরের মাঠে হিদায়াহ থেকে বঞ্চিত দুর্বল এবং উদ্ধত-দুই দল লোকের মধ্যকার আলোচনা উল্লেখ করেছেন

'আর তুমি যদি দেখতে জালিমদেরকে, যখন তাদের রবের কাছে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা অহংকারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা মুমিন হতাম'। যারা অহংকারী ছিল তারা, তাদেরকে বলবে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, 'তোমাদের কাছে হিদায়েত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'। (আল কোরআন, ৩৪:৩১-৩২)

এ দুই দল আল্লাহর সামনেই তর্ক করতে থাকবে। নিপীড়িতরা তাদের হিদায়াহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য নিপীড়কদেরকে অভিযুক্ত করবে। কিন্তু নিপীড়করা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে, নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের জীবনে আল্লাহর আইন গ্রহণ করে নিতে পারত। কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য না। মজার বিষয় হলো, আল্লাহ এ দুই দলের জন্যই একই উপাধি উচ্চারণ করেছেন, 'জালিমুন'। অর্থাৎ জালিম বা নিপীড়ক।

কেবল ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে চললেই সুবিচার নিশ্চিত হয় না, নিপীড়কের ভুল কাজ অনুসরণ করাও সুবিচার না। সুবিচারের জন্য দরকার সঠিক নির্দেশনা, অপরিবর্তিত মানদণ্ড ও সত্য এবং সঠিক কর্মপন্থা। সত্যিকার একটি নৈতিক মানদণ্ড ছাড়া নারীবাদীদের আসলেই সফলতার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা কেবল অযৌক্তিক অবস্থানকেই নৈতিক ভিত্তি বানিয়ে নিয়েছে, 'সমতা'। এর বাইরে তাদের কোনো নৈতিক অবস্থান নেই যার ভিত্তিতে আমরা অন্যায়, সুবিচার ইত্যাদির সংজ্ঞা ঠিক করব। যখন সমতাকেই আপনি নিজের একমাত্র দাবি বানিয়ে নেন, তখন কোন ক্ষেত্রে সমতা চান, কেন চান তাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। কেবল পুরুষের মতো হতে পারাই যদি সফলতা হয়, তাহলে আর কোনো সুবিচার অবশিষ্ট থাকে না। কেবল জুলুমের একটি চক্রই চলতে থাকবে, কখনো নারী ও কখনো পুরুষ হবে নিয়ন্ত্রক। আগুনের সাথে আগুন দিয়ে লড়াই করলে, সব ধ্বংস হবে।

পশ্চিমের পুতুল মালালার বিষাক্ত নারীবাদ

মালালা ইউসুফজাই যে পশ্চিমাদের হাতের পুতুল এটি নিয়ে আর কোনো মুসলিমের সন্দেহ নেই। তাকে ব্যবহার করে আফগানিস্তানে মার্কিন আত্মসন, গণহত্যাকে বৈধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মালালাকে পূর্ব ও পশ্চিমের সেতু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন পূর্বের মানুষ দিয়েই পূর্বে পশ্চিমের সংস্কৃতি রপ্তানি করা যায়। কিন্তু তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নারীবাদের মাধ্যমে।

নারীবাদীরা দাবি করে, সব পুরুষই সাধারণভাবে আক্রমণাত্মক এবং নারীদের প্রতি সহিংস। এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা। এসব নারীবাদীরা সবসময় নারী নির্যাতনের কিছু বিচ্ছিন্ন উদাহরণ টেনে এনে সমস্ত পুরুষকে এক পাল্লায় নিয়ে আসে। মজার ব্যাপার হলো, যখন কেউ সামগ্রিকভাবে কোনো গোষ্ঠীকে অহেতুক তকমা দিয়ে দেয় তখন নারীবাদীরাই তাদেরকে 'বর্ণবাদী' বলে আখ্যা দেয়। তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, লং মার্চ করে।

পুরুষেরা সহজাতভাবেই নারীদের প্রতি বিনয়ী হয়। পুরুষের মধ্যে আল্লাহ গাইরাতও দায়িত্ববোধ দিয়ে দিয়েছেন। যার কারণে নিজের বা আশেপাশের যেকোনো পরিবারের বিপদে তাঁকে বাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। এমনকি তা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। অন্যদিকে নারীদের মধ্যে এ প্রবৃত্তিটি নেই। নারীদের সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো বাচ্চাদের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত থাকা। পরিবারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যেকোনো কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার মতো পুরুষালি বলিষ্ঠতা তাদেরকে দেওয়া হয়নি।

বোঝাই যাচ্ছে, কেন আল্লাহ পুরুষকে নেতৃত্বের ভূমিকায় দিয়েছেন, নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাদেরকে এ কাজের উপযুক্ত করেই সৃষ্টি করেছেন।

তবে পুরুষের এ প্রবৃত্তির সুযোগ নেয় নারীরা। কয়েক ফোঁটা মেকি অশ্রু ফেলে এবং নিদারুণ কষ্টের কিছু মিথ্যা গল্প শুনিয়ে সুনিপুণভাবে পুরুষদের বশীভূত করে তারা। পুরুষ শিকার হয় প্রবঞ্চনার। তাদের এসব ছলনা পুরুষদের গাইরাতকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। তারা তখন সেই দুর্দশাগ্রস্ত মেয়েটিকে উদ্ধার করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। অথচ বাস্তবে হয়তো তাকে তেমন কোনো সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়নি।

নারীবাদীরা এভাবেই প্রোপাগান্ডা করে। তারা আজীবন দুষ্ট, নিকৃষ্ট, বিকৃত পুরুষদের নির্যাতনের শিকার হওয়ার দাবি করে মায়াকান্না করে। কয়েকটি নির্যাতনের ঘটনাকে চেরিপিক করে তারা সাধারণ হিসেবে চালিয়ে দেয়। পুত্র সমাজ যেন উন্মাদ হয়ে আছে নারীকে ধ্বংসের জন্য। তারা কিছু দাবি করে সবার হাসির পাত্র হয়, 'কাউকে Policeman বলবেন না। এখানে উইম্যান কোথায়? আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের এসব উদ্ভট প্রচারণায় কিছু পুরুষকেও शामिल হতে দেখা যায়। এ সকল হোয়াইট নাইটরা ঘুতো পেলেই পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা করে। তাদের কঠোর সমালোচনা করা উচিত। তাদের কারণেই নারীবাদীদের কাজ সামাজিক বৈধতা পায়।

বোঝার চেষ্টা করুন, ভাই। মালালায় ফিরে আসি।

সমস্ত মুসলিম পুরুষের ওপর এ ধরনের নারী আগ্রাসনের মূর্তপ্রতীক হলো মালালা। তিনি এটা বেশ উপভোগ করেন বলা যায়। তিনি মনে করেন (পশ্চিমা কুফফারদের সাথে বসে) জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করা উন্নিত, লিবারেলদের মতো সর্বোচ্চ আনন্দের পেছনে ছোট্টা উচিত, যেখানে বিশ্বজুড়ে তাঁর মুসলিম ভাই-বোনরা প্রতিনিয়ত নিপীড়ন এবং ড্রোন হামলার শিকার হচ্ছে।

২০১০ সালে উইকিলিকস একটি প্রতিবেদনে দাবি করে 'সিআইএ আমেরিকার আগ্রাসনকে বৈধ করতে নারীবাদকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রতিবেদনটি অনুযায়ী, নেদারল্যান্ডস আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করলে, অন্যান্য দেশগুলো খুব সম্ভবত তা-ই করবে। সিআইএ চেষ্টা করছে নারীবাদের মাধ্যমে দশ বছর ধরে ন্যাটোর চালানো আফগানিস্তানের আগ্রাসনকে ইউরোপীয়দের নিকট বৈধ করে তুলতে।

প্রতিবেদন থেকে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

'যদি দাবি করা হয়, তালিবানের উত্থান ওই এলাকায় অনেক কষ্টে অর্জিত নারী শিক্ষার উন্নতিকে উলটো দিকে ঠেলে দিতে পারে, তাহলে ফ্রান্সের সেক্যুলার নাগরিকরা গৎবাঁধা এই আগ্রাসনকে সমর্থন দেওয়া শুরু করবে।

অর্থাৎ এই ধরনের কারণসমূহ রক্তাক্ত ইনভেসন এর সমর্থন জোগাড় করে দেয় কারণ তারা এই ইনভেনশনকে দেখে 'কল্যাণময় সাধনা' হিসেবে।'

নারীবাদের বাস্তবতা

কিছুদিন আগে এক বক্তব্য দিয়ে তিনি আবার আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেন।

সেখানে তিনি জোরালোভাবে বলেন-

'আমি জানি না মানুষ আসলে কেন বিয়ে করে। আপনি যদি নিজের জীবনে কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন অনুভব করেন, তবে কেন একটি কাগজে আপনাকে স্বাক্ষর করতেই হবে? এটি কেন শুধু একটি পার্টনারশিপ হতে পারে না?'

কী নির্বোধ মন্তব্য। তিনিই-না গত বছর অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক হয়েছেন? অবশ্য এতেই অনেককিছু বোঝা যায়। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজকাল প্রকাশ্যে উন্ন নারীবাদীদেরকে উৎসাহিত করছে। এ নারীবাদীরা উন্মুক্ত যৌনতার প্রচার করে এবং LGBT আন্দোলনে মার্চ করে।

মালালা সকল কন্যাসন্তানের বাবাদের (এবং ভবিষ্যতে যারা কন্যাসন্তানের বাবা হবেন তাদের) জন্য একটি চরম সতর্কতা। আপনি কি চাইবেন যে আপনার মেয়ে বড় হয়ে ব্যভিচারের সমর্থক হোক? আপনি কি চাইবেন যে আপনার মেয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুল হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করুক? যদি তা না চান, তবে তাকে নারীবাদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করুন। তার মাথা থেকে নারীবাদী চেতনা যেমন 'দৃঢ়', 'স্বাধীনচেতা', 'স্বাবলম্বী' নারীকর্মী হওয়ার চিন্তা দূর করুন। আর কত নির্বোধ থাকবেন? সচেতন হোন এবং তাকে একজন বাধ্য স্ত্রী, একজন স্নেহময়ী মা হবার শিক্ষা দিন। যেন পরিবারের সেবা, সন্তানের লালনপালন করার মধ্য দিয়ে সে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে।

উম্মাহর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন এমন আদর্শ নারীর। মালালার মতো নারীবাদীরা উম্মাহকে কেবল পিছিয়েই দেবে।

মুসলিম নারীবাদ : উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন

সাধারণ মুসলিমরা নারীবাদ বলতে পশ্চিমা নারীবাদকেই বোঝে। কিন্তু মুসলিম নারীবাদীদের দাবি হলো, তাদের নারীবাদ ও পশ্চিমা নারীবাদ একই নয়।

তাদের মতে, পশ্চিমা নারীবাদ তারা কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা পশ্চিম থেকে শুধু 'নারীবাদ' শব্দটাই ধার করেছে। নিজেদের নতুন আন্দোলনের সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে এ মতাদর্শের নাম দিয়েছে 'মুসলিম নারীবাদ'। তারা অত্যন্ত জোরালো ছরে বলে, শুধু 'নারীবাদ' শব্দটি গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে তারা পশ্চিমা নারীবাদের সকল মূল্যবোধকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা মনে করে, নারীবাদের সমালোচকদের কোনোভাবেই সব নারীবাদকে এক পাল্লায় মাপা উচিত নয়। (#NotAllFeminists)

মুসলিম নারীবাদীদের দাবি, যদিও-বা নারীবাদের উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমে, কিন্তু এর মূল মূল্যবোধ পৃথিবীজুড়ে সব মূলধারার জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তারা মোটেই Femen আন্দোলনের মতো নন। অনেক প্রগতিশীল গবেষক এবং কর্মীরা নিয়মিত এর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন, বই-লিফলেটের মাধ্যমে আদর্শ প্রচার করছেন। মুসলিম নারীবাদীরা বিশ্বাস করে, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন মূল্যবোধগুলোই শুধু তারা গ্রহণ করেছে। কাজেই মুসলিমদের তাদের কাজের বিরোধীতা করার কোনো কারণ নেই।

বিষয়টি আসলেই অবাক করা। মুসলিমদের মধ্য থেকেই একটি জনগোষ্ঠী পশ্চিমের আদর্শ দিব্যি গ্রহণ ও প্রচার করে যাচ্ছে। মুসলিমরা বুঝতে পারে না, ঠিক কী কারণে তারা পশ্চিমা টার্ম, তাদের ওয়াল্ডভিউ, বুদ্ধিবৃত্তি, আইকন, সেকুয়ুলার চিন্তা গ্রহণ করছে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে ইসলামের ওপর আরোপ করছে। ইসলামের নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করছে। ইসলাম কি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান নয়? তাহলে আমাদেরকে ঠিক কোন কারণে পশ্চিমা নারীবাদীদের টার্ম এবং মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে হবে? ইসলামে কি এসবের সমাধান নেই?

মজার বিষয় হলো, যখনই মুসলিমরা এসব বিষয়ে মুসলিম নারীবাদীদেরকে প্রশ্ন করে, তারা তখন প্রচণ্ড রেগে যায়। এসবের জবাব দিতে গিয়ে তারা সবসময় ভিক্টিম কার্ড খেলে। নিজেদেরকে ভিক্টিম দেখিয়ে তারা বলেন, 'আপনি কেন মুসলিম নারীদের অধিকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন? নিজেদের অধিকার হওয়া সচেতন হওয়া কি অন্যায়?' এগুলো হাস্যকর, অর্থহীন জবাব। এটি প্রশ্ন ও সমালোচনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি আবেগপ্রবণ আবেদন

তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই না। তাদের যুক্তি অনুসারে, আপনি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন না। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কথা বলার মানে হলো দরিদ্র শ্রমিক জনসাধারণের বিরুদ্ধে কথা বলা!

নারীর অধিকারে বিশ্বাস করা আর নারীবাদী হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। আমি যিশুকে খ্রিষ্ট, নবী হিসাবে বিশ্বাস করি (গ্রীক ভাষায় মিসায়াহ)। আমি কি খ্রিষ্টান হয়ে গেলাম? আমি মনে করি যে দারিদ্র্য মানুষের জন্য অভিশাপ, দেশকে দ্রুত দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা জরুরি। এর মানে কি আমি একজন কমিউনিস্ট? আমি চাই জায়নবাদ ধ্বংস হোক। তাঁর মানে কি আমি অ্যান্টি-সেমিটিক? আসুন একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করি। নারীবাদীরা কি বিশ্বাস করে যে পুরুষদেরও সমান অধিকার থাকা উচিত? জবাব যদি 'হ্যাঁ' হয় তবে কি তাদেরকে 'পুরুষবাদী' বলা যাবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হলো 'না'।

যে কেউ কোনো লেভেল ছাড়াই দরিদ্র, অসহায়, ফিলিস্তিনি কিংবা অসহায় নারীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে পারে, তাদের পক্ষে জনমত তৈরি করতে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এ কাজ করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শের অনুসারী হতে হয় না। প্রতিটি মূল্যবোধ আসে কোনো না কোনো আদর্শিক ভিত্তি থেকে। যদি আমি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কথা বলি এবং এর প্রতিষেধক হিসেবে বলি যে সবার সমান পরিমাণ সম্পদ থাকা উচিত, ব্যক্তিগত মালিকানা ভুল, তাহলে আমি একজন কমিউনিস্ট। তেমনিভাবে যদি আমি ইহুদিদেরকে ঘৃণা করার কারণে, ইহুদি-মাত্রই হত্যাযোগ্য মনে করার কারণে জায়নিজমকে উচ্ছেদ করতে চাই, তাহলে আমি একজন অ্যান্টি-সেমিটিক।

একইভাবে, কেউ যদি এ বিশ্বাস করে যে নারী পুরুষের মধ্যকার সকল পার্থক্য নিছকই সামাজিক বৈষম্য, এভাবে একজন নারী কেবল নির্যাতিতই হচ্ছেন, নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং কর্তব্য থাকা উচিত, তখনই তাকে আমরা নারীবাদী বলি। যদিও নারীবাদের সংজ্ঞা, অবস্থান ও কর্মপন্থা নিয়ে নারীবাদীদের মধ্যেই অনেক মতবিরোধ আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই একটি বিষয়ে একমত। তা হলো-একজন নারী যেকোনো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার রাখে কোনো প্রকার বাধা ছাড়া। এতে পুরুষের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হলেও কিছু করার নেই। [নারীবাদের (Feminism) শেষে 'বাদ' বা 'ism' শব্দটিই প্রমাণ করে নারীবাদ একটি মতাদর্শ, কোনো কর্মপন্থা নয়]

নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সবকিছুকে সামাজিক বলে উড়িয়ে দেওয়া, জনসমক্ষে নগ্নতার প্রচারের মতো অনাচারকে আমি সর্বাংশে ঘৃণা করি, বর্জন করি। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে নারীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। অনৈসলামিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রে একজন নারী যেসমস্ত বৈষম্য এবং সহিংসতার শিকার হয়, সেসব অত্যাচার থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি কাজ করে যাব। তাই বলে কি আমি নারীবাদী?

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা শোচনীয়। তাদের রাষ্ট্রনীতিতে শরিয়াহর কোনো স্থান নেই। এমনকি অনেক আলেম পর্যন্ত শরিয়াহকে অবজ্ঞা করেন। মুসলিম নারীরা এ নাজুক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম করছেন। আমি এজন্য তাদের দোষারোপ করছি না। যাই হোক, যে নারীরা তাদের অধিকার অর্জনের জন্য নারীবাদের দারস্থ হন তাদের উদ্দেশ্যে 'The Dark Knight' চলচ্চিত্রের 'আলফ্রেড' চরিত্রটির একটি উক্তি বলতে চাই, 'তাদের হতাশার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে প্রবলভাবে একটি ধারণা গেলানো হয়েছে। তারা এমন একটি আদর্শকে গ্রহণ করে নিলো যা তারা পুরোপুরি বুঝতেও পারেনি।'

সত্য বলতে, এমন চর্চা ভালো নয়। এগুলো মুসলিমদেরকে ধীরে ধীরে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। দিনশেষে এসব মুসলিমরা নিজেদের 'নারীবাদী' বলেই দাবি করে এবং পশ্চিমা মূলধারার স্রোতে প্রবেশ করে, তাদেরই যুক্তি ব্যবহার করে, তাদের বই থেকেই কোট করে এবং তাদের আইকনদেরকেই নিজেদের আইকন বলে দাবি করে। কাফির লেখা হোক বা মুসলিমের, ইসলামবিদ্বেষী হোক বা না হোক, নারীবাদী যেকোনো প্রকাশনাকে তারা সমর্থন করা শুরু করে একপর্যায়ে। তারা কি তাহলে মনে করে যে ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম নয়? আর তাই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নারীবাদ প্রয়োজন? নাকি মনে করে নারীবাদই ন্যায়বিচারের মানদণ্ড? তারা কীভাবে নিশ্চয়তা দেবেন যে নারীবাদ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবেই?

মুসলিম নারীবাদীরা যাদেরকে 'পশ্চিমা নারীবাদী' বলে আখ্যায়িত করে, তারা নিজেদেরকে কেবল 'নারীবাদী'ই বলে। তাদের মতে, নারীবাদ নারীবাদই। কেন বলবে না? তারাই তো নারীবাদের জন্ম দিয়েছে। তারাই নারীবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে। নারীবাদীরা সমানাধিকারে বিশ্বাসী এমন সব আদর্শকে সমর্থন করে, হোক তা সেকুলারিজম, লিবারেলিজম, কমিউনিজম কিংবা প্যাগান। তারা নারী পুরুষের লিঙ্গের ভিন্নতাকে অস্বীকার করে। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন। আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহর কাছে নারী ও পুরুষ

উভয়ের আত্মার গ্রহণযোগ্যতা। সমান। কিন্তু পার্থিব জীবনে তারা অবশ্যই ভিন্ন লিঙ্গের এবং এ কারণে তাদের ভূমিকাও ভিন্ন।

মুসলিম নারীবাদীরা বিভিন্ন সময় 'ইসলামই যে সত্যিকার অর্থে নারীবাদী' তা প্রমাণ করতে ওঠে পড়ে লাগে। কিন্তু পশ্চিমা নারীবাদীরা একে চ্যালেঞ্জ করে। তারা বারবার প্রমাণ করেছে যে ইসলাম এবং নারীবাদ কখনোই এক নয়। তাদের ওয়ার্ল্ডভিউ, মূল্যবোধ ভিন্ন। নারীবাদীদের তোলা আপত্তির মধ্যে আছে পরিবারের নেতৃত্ব, মিরাস (উত্তরাধিকার), ভিন্ন অধিকার, পরিবার, সমাজ, যুদ্ধ ও রাজনীতিতে নারী-পুরুষের ভিন্ন দায়িত্ব ইত্যাদি। এবং প্রতিটি পয়েন্ট সত্য। এভাবে নারীবাদীরাই মুসলিম নারীবাদকে অর্থহীন প্রমাণ করে। তখন মুসলিম নারীবাদীরা নিয়ে আসে ব্যাখ্যার অস্ত্র। তারা নিজেদের মতো করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে থাকে। তাদের মতে, ইসলামের হাজার বছরের আলিমদের সিলসিলার প্রায় সবাই ভুলভাবে নারীদের অধিকার, দায়িত্বের বিষয়গুলো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

দামিনী মামলার ক্রেডিট অনেকেই এককভাবে সেদেশের নারীবাদীদের দেয়। ভারতের সেসকল কর্মীদের কথা তারা কীভাবে ভুলে গেলেন যারা নারীর প্রতি অন্যায়, ধর্ষণের বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার? এটি কি কেবল তারা নারীবাদী নয় বলে? পশ্চিমাদের স্বাধীনতার মতাদর্শই কি নারীবাদের জন্ম দেয়নি? এ উন্মাদ স্বাধীনতাই সৃষ্টি করেছে পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, বলিউড, গণমাধ্যম। এদের কাজের ফলে মানুষ নারীকে কেবলই একটি যৌন সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করে। নারী মানেই যেন যৌনতা এবং আদিম আনন্দ। মানুষ এখন চরম আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। নারীবাদীরা দাবি করত নারীর স্বাধীনতা নগ্নতায়। যৌন হয়রানি বন্ধে নারীর নগ্নতা কী কাজে এসেছে? বাবা-মা সব ধ্বংস করে রেখেছে আর তারা এখন তাদের সন্তানকে পাঠাচ্ছেন তা ঠিক করার জন্য। আমি একটি প্রশ্ন করি। কোনো দেশ যদি অত্যাচারী কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে থাকে তাহলে তারা কী করবেন? আপনি কি কমিউনিজম থেকে মুক্তির জন্য আরও কোনো উদার কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে কাজ করবেন? নাকি মানুষকে ইসলামের দাওয়াহ দেবেন যেন তারা সত্যিকার মুক্তি অর্জন করতে পারে?

পশ্চিমা মূলধারার মূল্যবোধ থেকে নিজেদের কিছুটা পৃথক করতে কিছু 'মুসলিম নারীবাদী' একটু ঘুরিয়ে বলেন, সাদা চামড়ার মানুষেরা এবং ঔপনিবেশবাদীরা পশ্চিমা নারীবাদের সংজ্ঞা তাদের 'নারীবাদের' ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বস্তুত এটা সত্য নয়।

দুঃখজনক কিন্তু সত্য, 'মুসলিম নারীবাদীরা' ইতিমধ্যেই তাদের চিন্তাচেতনায় উপনিবেশবাদী চিন্তা গভীরভাবে লালন করে। তারা মনে করে পশ্চিমা আদর্শের রঙে রঙিন হলেই কেবল তারা জাতে উঠতে পারবে। ক্যারিয়ার বা অর্থ উপার্জনের জন্য তারা সানন্দে নারীবাদ গ্রহণ করে নিয়েছে। পশ্চিমা অগ্রগতি দেখে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

এসকল মুসলিমরা যেকোনো মূল্যে 'নারীবাদ' টার্মটি ব্যবহার করতে চায়। কেননা শব্দটি পশ্চিমা। এভাবে পশ্চিমা প্রভুদের দয়া পাওয়া যায়, তাদের টেবিলে সীট পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে অর্থও উপার্জন করা যায়। এসকল টার্ম কি কোনো কুফর বহন করছে কিনা, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ওয়ার্ল্ডভিউ মুসলিম ভূমিতে প্রচার করতে চাচ্ছে কিনা তাতে কী আসে যায়! আপনি যে দেশের টাকা ব্যবহার করছেন তার মূল্য নির্ধারণ করবে সে দেশের কর্তৃপক্ষ। আমরা সবাই এটা জানি, মেনেও নিয়েছি। কিন্তু শেষমেশ আপনাকেই দিতে হয় অর্থ।

নিউ টেস্টামেন্টে যিশুর একটা বিখ্যাত বর্ণনা এসেছে। যখন যিশু হলি টেম্পলে বসে আছে, তাঁর বিরোধীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, রোমের প্যাগান রাজা ইহুদিদের ভূমি দখল করে রেখেছে। ধার্মিক ইহুদিদের কি এমন একজন রাজাকে কর দেওয়া উচিত?

'আমাদের কি এসব পৌত্তলিকদের কর দেওয়া উচিত হবে?'

যিশু ভালোভাবেই তাঁর গোত্রের মানুষদের ভণ্ডামি সম্পর্কে জানতেন। তিনি তাদের বললেন, 'কেন তোমরা আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছ?' এরপর যিশু তাদের একটা ডেনারিয়াস আনতে বললেন। তারা এনে দেওয়ার পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কার ছবি খোদাই করা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? কার শিলালিপি?' জবাবে তারা বলল 'সিজারের'। তখন যিশু বললেন, 'তাহলে সিজারের জিনিস সিজারকেই ফিরিয়ে দাও আর আল্লাহকে দাও যেটা তাঁর প্রাপ্য'। (Give back to Caesar what is Caesar's and to God what is God's.) তারা যিশুর উত্তরে বেশ অবাক হয়েছিল।

যিশুর উত্তরটা তাদের জন্য যথার্থই ছিল। কারণ তারা সানন্দে রোমানদের মুদ্রা গ্রহণ করত, আনন্দ করত, সবখানে ব্যবহার করত, এমনকি তাদের পবিত্র মন্দিরেও। কিন্তু কর দেওয়া থেকে বাঁচার জন্য তারা যিশুর সামনে এসে নিজেদের সাধু প্রমাণ করতে চায়। সব মিথ্যাচার মানুষেরই সৃষ্টি। যার থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু আসমান এবং

পৃথিবীর সবকিছুর কর্তৃত্ব শুধু আল্লাহর। মানুষের জীবনযাপন, আইন, অধিকার, দায়িত্ব-কিছুই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়।

চলুন, যিশুর মতো করেই আমরা নারীবাদীদেরকে জিজ্ঞেস করি, 'নিজদের সম্মান, অর্থ উপার্জন ও জাতে উঠার জন্য যে নারীবাদ তা কারা আবিষ্কার করেছে? এর নীতিগুলো কে ঠিক করে দিয়েছে? কে নিজের ছবি সেখানে খোদাই করেছে?' তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এর স্রষ্টা 'পশ্চিমা বিশ্ব'।

যিশুর মতো করেই জবাব দিন, 'পশ্চিমা মূল্যবোধ পশ্চিমাদেরই ফিরিয়ে দাও এবং আল্লাহর ইবাদাত করো এমনভাবে যেমনটা তাঁর প্রাপ্য।'

'তাহলে কি এরা আবার সেই জাহেলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভালো ফয়সালাকারী আর কেউ নেই। সূরা মায়েদা:৫০

ইসলামে নারীর সম্মান

নারী নির্যাতনের ইতিহাস প্রমাণ করে, আল্লাহর আইন ছাড়া আর সকল আইনেই নারীরা নির্যাতিত, অপদস্থ হয়েছে। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য, নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার জন্য নারীদেরকে তিনটি ঐতিহাসিক অবস্থা বা 'ওয়েভ'-এর মধ্য দিয়ে যাওয়া লেগেছে। কিন্তু লাভহয়নি। বরং আরোপ হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। সেকুলার গুরুরা এখন ভিন্ন ক্রিটিক্যাল কিংবা ডানপন্থী, এমনকি অনেক সময় ইসলামি ব্যাখ্যা দিয়ে হলেও নিজের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করে।

নারীবাদের সমস্যা আসলে অর্থনৈতিক। নারীবাদের তত্ত্ব কেবল শ্রমজীবী অধিকারকেই (আসলে ব্যাংকিং সেক্টরকে) লাভবান করেছে তা নয়; বরং এ নিহিলিস্টিক সিস্টেমে তারা নারীদের ওপর হওয়া সত্যিকার জুলুম নিয়ে কথা বলতে মোটেই আগ্রহী না। তাদের কোনো ঐশী কর্তৃপক্ষ নেই যে তাদেরকে শিখিয়ে দেবে কীসের দাম কেমন। তারা বস্তুবাদী জীবন আর অর্থনীতিকেই বানিয়ে নিয়েছে তাদের খোদা। তাই তা দিয়েই সব বিচার হয়। অর্থই সব।

আসুন, সেকুলার সিস্টেমে এবং ইসলামি সিস্টেমে নারীর সম্মানের তুলনা করি। ইসলামে মানবজীবন পুরোটাই حرمة শব্দের সাথে যুক্ত। বরাবর হবে না, ভাসাভাসা অনুবাদ করলে এর অর্থ পবিত্রতা। আল্লাহর কাছে মানুষের রক্ত, জীবন, সম্পদ, সম্মানের মর্যাদা পৃথিবীর যেকোনো বস্তুবাদী বিষয়ের চেয়ে বেশি। কেবল তাই না, রাসুলুল্লাহর মতে, মুসলিমের রক্তের মূল্য কাবার চেয়েও বেশি। নারীর সম্মানের মর্যাদা এখানে পরিবর্তন হবে না। ১। এ সম্মান অন্তর্নিহিত এবং অতিক্রান্ত, এ সম্মান আল্লাহর দেওয়া। ইসলাম বাদে আর কোনো আদর্শ এমন সম্মান দেয়নি। সেকুলার সমাজ তো আরও না। এখানে মানুষ হলো অর্থনীতির চাকা। ইসলাম সবাইকে নারীর সম্মান বোঝার দিকে আহ্বান করে। এ সম্মান আল্লাহর কাছ থেকে আসা, কোনো মানুষের ঠিক করে দেওয়া না।

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের প্রতিভা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম নারীরা আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন। কেননা সে তার সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য করে। আল্লাহ যেভাবে জীবনযাপন করতে বলেছেন সেভাবেই জীবনযাপন করে। আর আল্লাহকে আনুগত্যের মাধ্যমে একজন মুসলিম নারী স্বাভাবিকভাবে মানবতারও সেবা করে।

নারীর গর্ভকে সেকুলারিজমে হয় হয় করা হয় বা বস্তুগত উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু ইসলামে গর্ভের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। গর্ভের আরবি হলো রাহিম এবং এর মূলশব্দ রা-হা-মিম আবার আল্লাহর দুটি নাম বা গুণের মূল শব্দ: আর-রাহিম এবং আর-রহমান (অতি দয়ালু এবং পরম করুণাময়)।

ইসলামে তাই একজন গর্ভবতী নারীর সাথে অত্যন্ত কোমল এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা হয়। কিছু আফ্রিকান মুসলিম সম্প্রদায় সন্তান জন্মদানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। তাদের মধ্যে মা এবং সন্তানের জন্য বিশেষ নির্জনতার ব্যবস্থা করার প্রথা চালু রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'মহান আল্লাহ বলেন, আমার নাম রহমান- দয়াময়। আমি রেহেম (জরায়ু, আত্মীয় সম্পর্ক)-কে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে তাকে (গর্ভ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক) বহাল রাখবে আমিও তার সাথে (রহমতের) সম্পর্ক বহাল রাখব। আর যে তা ছিন্ন করবে আমিও তাকে আমার থেকে ছিন্ন করব।

ইসলামে গর্ভের এমন সুউচ্চ মর্যাদার কারণে নারী-জীবন এবং পরিবারের ধারক হিসেবে মূল্যায়িত হয়। ইসলাম নারীকে বস্তুবাদ এবং এর অন্তহীন, শ্বাসরুদ্ধকর প্রত্যাশা থেকে মুক্ত করে। বরং মাতৃত্বকে ইসলামেই প্রথম প্রকৃত সম্মান দিয়েছে এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করা করেছে। ইসলামে মাতৃত্বকে করা হয়েছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ। যখন এ গুরুত্ব এবং তাৎপর্য একজন মুসলিমা নারী অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তখন তার পার্থিব অন্যান্য সমস্ত উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। তারা তাদের দেহ-মনকে এসব প্রতিযোগিতামূলক মতাদর্শ এবং এদের মিথ্যা খোদাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পেরে আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন। মুসলিম নারীরা অনুভব করে যে শুধু আল্লাহই তাদের সবচেয়ে ভালো জানেন এবং ভালোবাসেন। অন্য কারও দ্বারা তা সম্ভব নয়।

আর যখন নারীবাদের মতো সেকুলার ধারণা মুসলিম নারীর অবস্থানকে খর্ব করতে পারে না, তখন তার ফলাফল দাঁড়ায় প্রশান্তি এবং আত্মবিশ্বাস। তাই অধিকাংশ মুসলিম নারীই এ ধরনের আক্রমণের মুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের রাস্তায় হাঁটা শুরু করে। এটি নারীবাদী সেকুলারিস্টদের ক্রোধ আরও অনেক গুন বাড়িয়ে দেয়।

১৪০০ বছর আগে ইসলাম নারীদের দিয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা। হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্মের আগে নারীদের সমাজে কোন অধিকার ছিল না।

তাদেরকে জীবন্ত পুতে ফেলা হতো। দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া ছিল লজ্জার বিষয়। ইসলাম এসে নারীদের এসব জুলুম থেকে মুক্তি দিয়েছে। মাকে দেওয়া হয়েছে পুরুষের উপর মর্যাদা। হাদিসে এসেছে –

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি বললোঃ অতঃপর কে? নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার মা। সে বললোঃ অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললোঃ অতঃপর কে? তিনি বললেনঃ অতঃপর তোমার বাবা।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৯৭১

ইসলাম এভাবেই নারীদের দিয়েছেন সর্বোচ্চ মর্যাদা।

নারীবাদীরা সেকুলার সিস্টেমের পণ্য

আমরা আমাদের সেকুলার এবং নারীবাদী বোনদের কিছু মনে করিয়ে দিতে চাই।

সেকুলারদের 'অধিকার-ভিত্তিক' সমাজে, নারীর দেহ, বৈশিষ্ট্য, অন্তর-সবই এই খাদক সিস্টেমের টার্গেট। পড়ালেখা কিংবা কর্মক্ষেত্রে, এমনকি সেকুলার পরিবারগুলোতেও নারীরা তাদের বস্তুবাদ, টাকা-পয়সা দিয়ে মূল্যায়িত হয়। বস্তুবাদী চাহিদায়, আরেক মানুষের লালসা দিয়ে নারীর মূল্য নির্ধারণ করা হয়, হোক তা কর্পোরেট কোম্পানির মালিক। যৌনবিকৃত নারীরাও অর্থ, সম্পদ ও জনপ্রিয়তার মোহে উন্মাদ হয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে এসবের পেছনে না ছুটলে মুক্তি নেই। কিন্তু নারী কি আসলেই অন্তর থেকে শান্তিতে আছে? আসলেই কি এগুলোর নারীর প্রকৃত পরিচয়? সত্যিই তো, কীভাবে হবে?

এ প্যারাডাইমে নারী খুবই ভঙ্গুর। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে নানান ধরনের আজব বেশ ধারণ করতে হয়। তাঁকে তৈরি করতে হয় শিথিয়ে দেওয়া 'আধুনিক', 'সফল' নারীর ব্যক্তিত্ব। বস্তুবাদ ও জাতে ওঠার আগুনে মশকির পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে নারী। শিক্ষা, গণমাধ্যম, মুভি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক ডকুমেন্টারি-সবকিছুই নারীকে এমন হয়ে উঠতে উৎসাহ দিচ্ছে, চাপ দিচ্ছে। নারী পরে যাচ্ছে এক অসম লড়াইয়ের মাঝে।

এসব আধুনিক নারীরা যখন নারীবাদী কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও প্রোপাগেটর হয়ে যায়, তা হলো সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক। এমন সব আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে ইসলামবিদ্বেষী, খোদাদ্রোহী একদল লোক, নৈতিকতার যাদের কোনো বালাই নেই। নিজেদের মতো নৈতিকতা আরোপ করে মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে একেই স্বাধীনতা বলে আখ্যা দেয় তারা। আসলে 'আধুনিক' নারীরাই জুলুমের হ্যান্ডমেইড। জুলুম চালানোর মূল অস্ত্র হলো নারীবাদ ও সেকুলারিস্ট হিউম্যানিজম। দুটো আদর্শ প্রথমেই আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সকল নীতিমালাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

মানুষ মাত্রই কোনো অর্থরিটি চায়, কর্তৃপক্ষ চায়। তাই জালিমরা মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরেক ধরনের পূজা নিয়ে আসে। এ অন্য খোদা হলো সেকুলার রাষ্ট্রের সরকার এবং এ বস্তুবাদি পুঁজিবাদী সিস্টেম। এ জুলুম থেকে বাঁচতে চেয়ে আবার এ জালিমদের তত্ত্বই কপচানো অর্থহীন। এভাবে জালিম আরও শক্তিশালী হয়। যেন সিংহ নিজের মুক্তির জন্য খাঁচার দেয়ালে বারবার আঘাত করছে। কিন্তু এভাবে খাঁচা তো ভাঙছেই না; বরং শেকলগুলো

আরও শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। এদিকে তাঁর সংগ্রাম, অপমানজনক সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পায় দর্শক, খাঁচার মালিক উপার্জন করে নেয় কিছু অর্থ।

এসব সেক্যুলার নারীবাদী ধারণাগুলো বদলাবে। সময়ে সময়ে তাদের স্বাধীনতার সংজ্ঞা বদলাবে, সময়ের সাথে সাথে নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার জন্য তারা অনেক কিছুই করবে। দিনশেষে নির্ধারিত হবে না নারীর অধিকার, মুক্তির পথ। সাধারণ নারীবাদীরা আশা করে থাকে সেক্যুলারিজম সবাইকে সুযোগ দেবে এবং এর হাত ধরেই আসবে সমতা ও স্বাধীনতা। এ পন্থায় নারীর ভবিষ্যতে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই।

নারীবাদী নারীদেরকে নিজেদের সত্যিকার মূল্য বুঝতে হবে। তাদের মুক্তির প্রথম ধাপ হলো নারীবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বের করে নেওয়া। তাদের বোঝা উচিত, নারীবাদ যাকে মুক্তি বলে তা আসলে দাসত্ব, বন্দিত্ব। নারীবাদ যাকে বন্দিত্ব বলে দেখিয়েছে, শিখিয়েছে তাতেই আসলে মুক্তি। পপ কালচার বা প্রশাসনের শিখিয়ে দেওয়া বুলি মুক্তি না, মুক্তি আছে দাসত্বে, পরম করুণাময়ের দাসত্বে।

বিষয়টি বুঝতে হলে আধুনিক নারীদেরকে তাদের আগের সব মানসিক বেড়াজাল, জাতিগত ঘৃণা, বস্তুবাদী শিক্ষার সব ভূত থেকে বের হয়ে এসে ইসলামকে জানতে হবে। জানতে হবে জানার ও বোঝার মানসিকতা নিয়ে।

নারীরা পরম করুণাময় আল্লাহর অন্যতম সুন্দর এক সৃষ্টি। তারা কেবল আল্লাহর দাসত্ব করতে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতেই জন্মেছে; পুরুষের কাছে নয়। যদি এ সহজ সত্য তারা মেনে নেয়, আল্লাহ ও দ্বীনকে ভালোভাবে জানে, তাহলে তারা বুঝবে কোথায় লুকিয়ে আছে তাদের শক্তি, পৃথিবীর উন্নয়ন আসলেই কীসে নিহিত এবং তারা কীভাবে ঘৃণার চর্চা না করে শান্তি ফিরে পাবে।

সেক্যুলার লিবারেলিজমের 'উন্মুক্ত প্রণয় অসংগতি'

সেক্যুলার লিবারেল সমাজে মানুষ সেক্স-এনলাইটমেন্ট নামের এমন এক ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার ধারণায় বিশ্বাস করে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো যেকোনো মূল্যে নিজের কামনাবাসনা পূরণ করা।

এই 'অবাধ স্বাধীনতার' নামে মানুষ যা খুশি করছে, কেবল ওপরে উঠার জন্য। কর্পোরেশনগুলো নিজ স্বার্থে যৌনতাকে ব্যবহার করছে, ফ্যাশনের নামে অলিঙ্গ সব ধারণা ছড়াচ্ছে এবং নারীকে যৌন সামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করছে কেবল জামাকাপড় এবং রূপচর্চার সামগ্রীর সেল বাড়ানোর জন্য। ফিল্ম প্রোডিউসাররা তাদের ফিল্মে যৌনতা ব্যবহার করছে যেন বক্স-অফিসে বেশি টিকেট বিক্রি হয়। পরিণতিতে একটি উগ্র যৌনতাভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠছে। এ ধরনের যৌনায়িত সমাজ ব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত যৌন হয়রানি ব্যাপক হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক।

কারও প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করলে কেন মানুষ যৌন আবেদন জানাবে না? তাকে সবক্ষেত্রে ইচ্ছামতো প্রবৃত্তিপূজা করতে শেখানো হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও সে তাই করছে। সবখানে নারীর এমন যৌনায়িত প্রদর্শন তাকে কি নারীর প্রতি সম্মান শেখায়? শেখায়? নাকি নারী মাত্রই যৌন সামগ্রী-এমন শিক্ষা দেয়? তাহলে কেন সে নারীদেরকে এভাবে দেখবে না? সাধারণ যৌন আবেদনের ক্ষেত্রে দুটো প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, অনেক সময় দুটো একসাথেই

প্রথমত, অনেকে পছন্দের সঙ্গীকে আকর্ষণ করতে জনসম্মুখে নিজেকে সর্বোচ্চ আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। এজন্য তারা নিজের দেহ প্রদর্শন করে, নিজের বাহ্যিক রূপকে আকর্ষণীয় করে তোলে, নিজের সম্পদ প্রদর্শন করে এমনকি নিজের পদমর্যাদার বড়াইও করে।

দ্বিতীয়ত, কাউকে আকর্ষণীয় মনে হলে অনেকে আবার জনসম্মুখেই তার কাছে গিয়ে যৌন আবেদন জানায়। তাকে প্রস্তাব দেয়, ফ্লাটিং করে, প্রলোভিত করার চেষ্টা চালায়। ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া এ সমাজব্যবস্থায় অনেকেই মনে করে, যদি আপনি এমন পদক্ষেপ না নেন, তবে আপনি আপনার কাক্ষিত জিনিস পাবেন না।

এ অনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় সব ধরনের যৌনতা বৈধ। '৬০ এবং '৯০-এর দশকের যৌন বিপ্লব এ সভ্যতাকে করেছে প্রবল যৌনায়িত। এখানে এমন অসংখ্য মানুষ থাকাটাই স্বাভাবিক যারা কিনা প্রায়ই অবাস্তব যৌন প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়-হয়তো তাদের কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছে যৌন আবেদন করা হয়েছে অথবা আবেদনকারীকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়নি। আর যখন কেউ যৌন হয়রানিকে 'অযাচিত যৌন আবেদন' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে তখন যৌন হয়রানির কারণগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ বিষয়টি 'প্রণয় অসংগতি'র সৃষ্টি করে। এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হতে হচ্ছে ততক্ষণ 'নিজেকে ব্যক্ত করার', 'যৌনতা

উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করার', 'বাকস্বাধীনতার' ইত্যাদির অনুমতি রয়েছে, এমনকি সামাজিকভাবে এসব কাজকে উৎসাহিত করা হয়। কাজেই পশ্চিমা উদারনীতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনসম্মুখে ফ্লাটিং করা এবং কারও মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা অবৈধ কিছু না। এখানে সবই যৌনতাকেন্দ্রিক। মানুষকে মানবিক করে তুলতে পারে এমন কোনো সামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব তাদের নেই। যা-ই হোক, যৌন হয়রানিকে 'অবাস্তব যৌন আবেদন' হিসেবে বিবেচনা করেই বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানুষ প্রায়ই অন্যের আগ্রহ সম্পর্কে ভুল ধারণা করে বসে। মানে এখানে কাজটা সমস্যা না। নারী কী হিসেবে দেখছে তা সমস্যা। সে কেবল আবেদন করার পরেই আবিষ্কার করতে পারে তার আবেদনকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হবে কি-না। নারীর প্রতিক্রিয়ার আগে বোঝার সুযোগ নেই কাজটি ঠিক হলো না ভুল। আর এভাবেই আমরা একটি আদর্শিক দ্বন্দ্ব পৌঁছাই: সেক্যুলার ২০১২ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, 'নারীরা পুরুষের তুলনায় সূক্ষ্ম যৌন হয়রানিমূলক আচরণগুলো খুব সহজে ধরতে পারে। অন্যভাবে বললে, নারী-পুরুষ উভয়েই যৌন নিপীড়ন এবং সাহায্যের বিনিময়ে যৌন সম্পর্ক দাবি করার মতো জঘন্য কাজগুলোকে যৌন হয়রানি হিসেবেই দেখে, কিন্তু নারীদের তুলনায় পুরুষেরা সূক্ষ্ম যৌন হয়রানিমূলক আচরণগুলো কম বুঝতে পারে'।

সেক্যুলার লিবারেলিজম যৌন হয়রানির সমাধানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণকে স্বীকার করতে চায় না। অথচ ফ্লাটিং বা হুক আপ কালচারে ঠিকই স্বীকার করা হয়। সেই সাথে এর কোনো কার্যকরী সমাধানও দিতে পারে না। মানুষের নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিবাদের (Individualism) ওপর ছেড়ে দেওয়ার কারণেই সমাজে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের চাহিদার কোনো সীমা থাকছে না। একপর্যায়ে সে বিকৃত এবং অমানবিক উপায়ে নিজের সহজাত চাহিদা পূরণ করছে।

অবাক করা বিষয় হলো, #Metoo মূল হোতা হলিউডের নায়ক-নায়িকাদের ফিল্মগুলোই আত্মকেন্দ্রিকতা (self-gratification) এবং অশ্লীল যৌন আচরণ সমাজে স্বাভাবিক করেছে, মানুষের আচরণকে যৌনায়িত করেছে, হুক আপ কালচারকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছে। এসব ফিল্মগুলোই সমাজে অবাধ যৌনতা ছড়িয়েছে এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে যৌন হয়রানির সাথে এগুলো সম্পর্ক রয়েছে।

সমস্যাটি নিয়ে হ্যাশ-ট্যাগিং না করে বরং একটি সমাধান খুঁজে বের করুন।

সেকুলার লিবারেলিজমের উদারনীতির বিপরীতে ইসলাম এই কঠিন সমস্যার লাগাম টেনে এটিকে একটি নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে এসেছে। মানুষের যৌন জীবনকে সামাজিক প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে মানবিকভাবে আরও অনেক বেশি দায়িত্বশীল করেছে। ইসলাম বিয়ের মতো একটি কল্যাণকর ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে জনপরিসরকে সকল প্রকার যৌনচিন্তা এবং রাজনীতি থেকে মুক্ত রেখেছে।

ইউসুফ আ.-এর ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবীর পবিত্রতম চরিত্রের ব্যক্তিরও (আল্লাহর একজন নবী) প্ররোচিত হওয়ার ভয় করতেন। তাই জুলাইখার মতো সুখ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সেই ফাঁদে পা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রলুদ্ধ অন্তর আর দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তিরও যখন একত্রিত হয় তখনই ব্যক্তি এবং সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে।

ইসলামের বিধানসমূহ ব্যক্তি ধরে ধরে চারিত্রিক দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং প্রলোভন দূর করার আশ্বাস দেয় না। বাস্তবে তা অসম্ভব। কিন্তু ইসলাম মানুষের নৈতিক পদস্থলন থেকে রক্ষার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেয় যাতে এ দুর্বলতাগুলো যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা যায়। ইসলাম আমাদেরকে এমন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে শেখায় যা আমাদেরকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে, আমাদের সম্মান যেখানে মৌলিক বিষয়। ইসলাম আমাদেরকে একটি সুন্দর সমাজ পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

সেকুলার লিবারেলরা পৃথিবীর সবকিছুকে ভোগবাদী এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে। তাদের আনন্দ, কষ্ট, হতাশা সবকিছুই বস্তুকেন্দ্রিক। এটি মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এতটা অক্ষম করে তোলে যে সে মানুষকে পর্যন্ত ভোগের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে। তার কাছে একজন মানুষের মূল্য হলো তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারার কমেডিটি।

আদি বিন হাতিম তাই রা. বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ বলেন, 'এমন একটি সময় আসবে যখন একজন নারী ইরাক থেকে মক্কা সম্পূর্ণ একাকী ভ্রমণ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।'

এ হাদিসটি কিন্তু সেই সময় হাদিস যখন রাসুল মক্কা বিজয় করে ফেলেছেন। তার মানে তখন পর্দার আয়াত নাজিল হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিম নারীরা, উম্মুল মুমিনিনরা এমনভাবে পর্দা করতেন যে তাদের এক চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যেত না। তাহলে রাসুলুল্লাহ আসবে কেন বললেন? তখনো তো মুসলিম নারীরা যত বেশি পর্দা করা সম্ভব, যত বেশি নিজেকে ঢেকে রাখা সম্ভব তার সর্বোচ্চটা করতেন। তাহলে তখনও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো না কেন?

এখান থেকে আমরা একটি মজার বিষয় পাই। তা হলো কেবল পর্দা নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। ইতিহাস থেকে দেখি, আদি বিন হাতিম তাই নিজেই বলেন যে, এ সকল অঞ্চল মুসলিমদের হাতে আসার পর, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরই পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ এমন একটি সমাজ, যেখানে বাচ্চারা দ্বীন শিখে, নারীর প্রতি সম্মান, হুদুদের শাস্তি দেখে বড় হয়। তারা নারী অবমাননায় জাহান্নামের ভয় পেতে শেখে, নারীকে যৌনবস্তু না বরং নারী হিসেবেই সম্মান করতে শেখে, যৌনতা কেবল স্ত্রীর জন্যই বরাদ্দ রাখতে শেখে।

আমরা এমন একটি সভ্যতার তৈরি করে রেখেছি যেখানে সবকিছুতে যৌনতা।

পত্রিকায় যৌনতা, গালিতে যৌনতা, মুভিতে যৌনতা, রাস্তার বিলবোর্ডে যৌনতা, এডভারটাইজে যৌনতা-মোটামুটি পারভার্ট একটি সভ্যতা। আমাদের ভাইয়েরা, আমাদের ছেলেরা ইচ্ছামতো মুভি দেখে, বিনোদন পাতা পড়ে, ঘরে ডিশ লাগিয়ে যাচ্ছেতাই স্ট্রিমিং করে। তারা পতিতা, বিজ্ঞাপনের মডেল, টমবয় সকলের প্রতিই যৌনতা অনুভব করে। আমাদের হাতে কোনো খিলাফাহও নেই যে পর্ন বন্ধ করবে, পাথর মেরে ধর্মকের ধর্মণের স্বাদ জীবনের মতো ভুলিয়ে দেবে।

আর এ সবকিছু করার পর যখন আপনার ছেলে ধর্ষণ করে তখন আপনি বলেন, 'আবে। আমি তো আমার ছেলেকে এ সবকিছু শেখাইনি।' বস্তুবাদের বিপরীতে ইসলাম মানুষের পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদার একটি দৃঢ় ভিত গড়ে দেয়।

'নিশ্চয় আমি আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি তাদেরকে সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' [কুরআন: ১৭:৭০]

সেকুলার লিবারেলিজমের 'হার্ম প্রিন্সিপাল' অনুযায়ী নারী পুরুষ একে অপরের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা, চোখ দিয়ে গিলে খাওয়া ইত্যাদিতে কোনো বাধা নেই। কেননা এতে কারও শারীরিক কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু ইসলাম মুসলিমদেরকে তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে এবং উত্তম চরিত্র অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়।

'মুমিন পুরুষদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ায়। তারা যেন তাদের বক্ষ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'

[কুরআন ২৪: ৩০-৩১)

ইসলাম বিনয় এবং কোমলতাকে মুমিনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করে এবং সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌনতাকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করে।

হিজাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

'হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'।

[কুরআন: ৩৩:৫৯]

হিজাব একটি ব্যক্তিগত ইবাদাত না বরং এর ভূমিকা সামাজিক। আর তা হলো, সমাজে নারীকে একটি যৌন সামগ্রীতে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করা। এটা সত্য যে হিজাব পরার

মাধ্যমেই কেউ যৌন হয়রানি থেকে নিরাপদ হয়ে যায় না। তবে গবেষণায় (জনসম্মুখে মেকআপ ও খোলামেলা পোশাক পরিধানকারী নারীদের নিয়ে করা গবেষণা এবং হিজাব-জিলবাব পরিহিতা নারীদের নিয়ে করা গবেষণায়ও) দেখা গেছে যে, হিজাব পরিহিতা নারীরা তুলনামূলক কম হয়রানির শিকার হন। যদিও পশ্চিমে হিজাব আপনাকে ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না।

ইসলামে জনপরিসরে, একান্তে অপ্রয়োজনে অপরিচিত/অবিবাহিত নারী পুরুষের কথোপকথন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসুল বলেছেন, 'কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্তে অবস্থান না করে। কেননা সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে শাইত্বান উপস্থিত থাকে'। বেশিরভাগ যৌন হয়রানির ঘটনা যে চেনা পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ঘটছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

অপরিচিত নারী-পুরুষের একে অপরের সাথে আচরণ কেমন হবে ইসলামে তার একটি স্পষ্ট নির্দেশনা আছে। নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো প্রকার শারীরিক স্পর্শ ইসলাম অনুমোদন দেয় না, তা সে স্পর্শ যতই 'বন্ধুত্বপূর্ণ' হোক না কেন। তাদের মধ্যকার কথোপকথন কেবল কাজের কথায় সীমাবদ্ধ। কথা হবে কাটছাঁট এবং সংক্ষিপ্ত। কোনো অপ্রয়োজনীয় খেজুরে আলাপ জুড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্র-পাত্রী সাক্ষাৎ করতে পারবে, কিন্তু তা অবশ্যই তৃতীয় একজনের উপস্থিতিতে হবে। ইসলামে বিয়ে ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ নেই এবং তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

ইসলামের বিধানগুলোর মানে এই না যে সবাই এমন অপরাধগুলো করে, ইসলাম নিরপরাধকে শাস্তি দেয় না। বরং এই বিধানগুলোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করা যাদের-

‘অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যার দরুন সে প্রলুদ্ধ হয়’।[কুরআন:৩৩:৩২]

#Metoo আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে যৌন হয়রানির মূল কারণগুলোর তদন্তে নামা যেত। যৌন হয়রানির সমস্যা কঠোরভাবে মোকাবিলা করার জন্য যে সাহস দরকার ছিল তার জোগান দিতে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করা যেত। তবে যৌন নিপীড়ন ও হয়রানির সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করা আগে স্বীকার করে নিতে হবে যে এই সমস্যাগুলো লিঙ্গ নির্ভর না। বরং বিকৃত মানসিকতার সাথে পরিস্থিতি (অর্থাৎ যৌনায়িত সমাজ) একত্রিত হয়েই এসব সমস্যার সৃষ্টি। আর এই পরিস্থিতির জন্মদাতা হলো সেকুলার লিবারেলিজমের পবিত্রতম

বিশ্বাস-ভোগবাদ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা। এর কারণে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হয়ে যায় যে, সে অন্যদের ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্বের আগে নিজেকে ও তার চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়।

মুসলিম বিশ্বে ইসলাম কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এই সামাজিক সমস্যাগুলোর শিকার হওয়ার লক্ষণগুলো কমিয়ে আনতে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এতে কেবল সমস্যার প্রতিকারই হবে যদি এর পাশাপাশি আমরা সমস্যার মূল কারণগুলো খুঁজে বের না করি। আর প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম।

কিন্তু সেক্যুলার লিবারেল গুরুরা এসব করতে রাজি না। তারা যে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে সে একই ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামেই অনেকে নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করছে। এর ফলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে যৌন হয়রানির মতো সমস্যাগুলো সহজেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে ইসলামে সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহর বিধানকে স্থান দেওয়া হয়। ইসলাম সকল প্রকার জাহিলিয়াহ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চায় এবং জনসম্মুখে মানুষের কুপ্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশকে প্রবলভাবে নিরুৎসাহিত করে। ইসলাম মানুষকে বিনয়ী, মর্যাদাবান এবং দায়িত্ববান হওয়ার শিক্ষা দেয়।

'আল্লাহ তোমাদের বিধান (সহজ) করতে চান। আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।'
[কুরআন ৪:২৮]

জব সেষ্টরে নারী

ইসলামি শরিয়াহ নারীর প্রতি সবচেয়ে দয়াশীল ও ফিতরাতবান্ধব নীতিমালা প্রদান করেছে। পরিপূর্ণ ঘরে থাকা অবস্থাতেও ইসলামি শরিয়াহ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। এর জন্য তাকে বাইরের দুনিয়ার নাকানিচুবানি, কষ্ট-ক্লেশ, ব্যস্ততা ও পরিশ্রমের শিকার হতে হয় না।

ইসলামি শরিয়াহর পক্ষ থেকে পুরুষরা তাদের অধীনস্থ নারীদের ব্যয়ভার বহন করতে আদিষ্ট। তাদের প্রতি এই নির্দেশ অনুগ্রহ হিসেবে নয়; বরং আবশ্যিকতার জায়গা থেকে পুরুষরা নারীদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে আদিষ্ট। নারীদের এই ব্যাপারে কোনো প্রকার খোঁটা কিংবা খোঁচা দেওয়ার অধিকার তাদের নেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

'প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচা দেবে আর যার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে খরচা দেবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন, তার বেশি ভার তার ওপর অর্পণ করেন না। কোনো সংকট দেখা দিলে আল্লাহ তারপর স্বাচ্ছন্দ্যও সৃষ্টি করে দেবেন।'

الرِّجَالُ قَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اتَّفَقُوا مِنْ أُمُورِهِمْ

'পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ (নারীদের জন্য) নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।' (সূরা নিসা, আয়াত ৩৪)

আবার নারীরা তাদের মালিকানাধীন অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীন। তারা বৈধ যেকোনো ক্ষেত্রে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করতে পারবে।

শরিয়াহনুসারে একজন নারীর প্রধান দায়িত্ব হলো, গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা, পরিবার গড়ে তোলা, পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করা এবং ঘরের ভেতরটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা

করা; এটাই একজন নারীর মূল পেশা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারী তার স্বামীর ঘরের প্রতি দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'

তবে কোনো প্রয়োজন কিংবা কল্যাণের কারণে কোনো নারী চাকরি করতে বাঙ হলে ইসলাম নারীকে তার অনুমোদন দিয়েছে। সাথে সাথে চাকরির জন্য কিছু শর্ত ও সীমাও বেঁধে দিয়েছে। যেন সেই নারীর দীন ও ফিতরাত সংরক্ষিত থাকে। যেমন অবশ্যই সেই কর্মটা নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া ও অবস্থানের সময় অবশ্যই তাকে শালীনতা, পর্ব, ইবাদাহ বজায় রাখতে হবে এবং ফ্রি-মিক্সিং ও পরপুরুষের সঙ্গ থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে, ফিতনা ও উত্তেজনাকর স্থান থেকে নিরাপদ থাকতে হবে এবং তার এই চাকরি পরিবারের দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টিকার না হতে হবে।

এজন্যই ইসলাম নারীদের জন্য সাধারণ নেতৃত্বকে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ, নেতৃত্বদান তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এই কাজ তার মূল জায়গার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তা ছাড়া নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাইরের তৎপরতাসমূহ পরিচালনার সময় তার পক্ষে ইসলামের আবশ্যিকীয় বেশ কিছু বিধান পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে। নেতৃত্বের সাধারণ দাবিই এমন যে, জনসাধারণের মাঝে বেশি বেশি যেতে হবে, নারী-পুরুষ সবার সাথে মিশতে হবে। অনুরূপ আরও জটিলতা আছে, যা নারীর দীন-বিশ্বংসী হতে পারে।"

নিশ্চয় ইসলাম নারী-পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মের মাঝে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দিয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে কখনোই ইসলাম নারীর মর্যাদাহানি করেনি। তার মানব-প্রকৃতি ও যোগ্যতার ব্যাপারে তিরস্কারও করেনি। এই পার্থক্য কিংবা প্রভেদ নারী-পুরুষের সম্পূর্ণ জীবনকে সহজ করার লক্ষ্যেই করা হয়েছে। এই পার্থক্যের ভিত্তি হলো, ইনসাফ এবং নারী-পুরুষের মাঝে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতার ভিন্নতা।

যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও দায়িত্বে নারী-পুরুষের মাঝে সমতার বিধান করতে চায়, তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে একই শরীরের প্রতিটি অঙ্গের দায়িত্ব ও কর্মের মাঝে সমতার বিধান করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ সে কোনো প্রকার প্রয়োজন ছাড়াই হাতকে হাঁটার সময় পা'কে সহযোগিতা করতে জোর করে; কিংবা চোখের ব্যাপারে আফসোস করে, কারণ সে শুনতে পায় না। আবার কানের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে দেখতে না পারার কারণে।

এভাবে সে মূলত নিজের অঙ্গগুলোকে উন্মাদনার দিকে ঠেলে দেয়। এটাকে জ্ঞানীরা পাগলামি ছাড়া কিছুই বলবে না।"

নারীর কর্মের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান মানব-প্রকৃতি, নারীর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বণ্টননীতির সাথে পরিপূর্ণ উপযোগী ও নিরাপত্তাশীল।

র‍্যাড কর্পোরেশনের মতে, অধিকহারে নারীদের কর্মক্ষেত্রে যোগদান উপ্রতিও আধুনিকতার নিদর্শন। অপরদিকে কর্মক্ষেত্র থেকে নারীদের দূরে রাখার অর্থ হচ্ছে দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে অকেজো করে রাখা।

এজন্য র‍্যাড কর্পোরেশন মুসলিম নারীদের অধিকহারে চাকরির বাজারে নিয়ে আসা এবং তাদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়ার প্রতি আগ্রহী। তবে মূল বাস্তবতা হলো, সংস্থাটির আগ্রহের জায়গা এটা না যে, নারীরা কাজ করুক এবং সম্মানজনক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে তুলুক; বরং অধিকহারে নারীরা কর্মক্ষেত্রে আসার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে যেসব প্রভাব ও পশ্চিমা স্বার্থের বিস্তার দেখা যায়, সেগুলোই তাদের মূল আগ্রহের জায়গা। এজন্য সংস্থাটির কাছে নারীরা কাজ করছে এই বাস্তবতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা কী কাজ করছে, কোন সেক্টরে কাজ করছে এবং কেমন পরিবেশে কাজ করছে।

কাজের কাজিত ধরন ও সেটর

উইমেন এন্ড ন্যাশন বিন্ডিং রিপোর্টে র্যান্ড কর্পোরেশন নারীর কর্মের ব্যাপারে ২০০৪ সালে জাতিসংঘ তাদের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে যে দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে এনেছিল, সেটাকেই চিহ্নিত করে। সেটা হলো, বেতনের পরিবর্তে নারীকে তার কর্মের ধরনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও সুগঠিতকরণ অধিক ফলপ্রসূ।"

উক্ত রিপোর্টে সংস্থাটি পরামর্শ দেয়, ঐতিহ্যবাহী সেটরগুলোর বাইরে অন্যান্য সেটরগুলোতেও ব্যাপকহারে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে হবে।"

এজন্য সংস্থাটি আফগান নারীদের প্রসিদ্ধ গালিচা-শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয়। তাদের মতে এই কাজ অনেক কষ্টের এবং এতে নারীরা স্বল্প পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। এমনকি যদি অধিক পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তবুও তারা নারীর এমন কর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না পূর্বে উল্লেখিত মূল্যায়ন নীতি অনুযায়ী।

তারা চায়, নারীরা পুলিশ হিসেবে কাজ করুক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে যোগ দিক, পার্লামেন্টারিতে আসুক।" খুবই হাস্যকর একটি ব্যাপার হলো, গালিয়া-শিল্পকে তারা খাটুনিদায়ক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল, পরক্ষণেই নারীদের পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর চাকরিতে আগ্রহ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। স্বভাবজাত দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কাজটা নারীর জন্য বেশি কষ্টের-গালিচা-শিল্পে কাজ করা না-কি পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীতে কাজ করা?

র্যান্ড কর্পোরেশন নারীদের যেসব সেটরে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তার মধ্যে সবচেয়ে কাজিত সেটরটি হচ্ছে সাধারণ রাজনীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদ, সংসদ-সদস্যসহ রাজনৈতিক পদসমূহ।"

সংস্থাটির কাছে নারীদের জন্য কাজিত ও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সেটর হলো বিচারবিভাগ। 'র্যান্ড কর্পোরেশন' উইমেন এন্ড ন্যাশন বিন্ডিং রিপোর্টে আফগান নারীদের পরামর্শ দিয়ে বলে, সমস্ত নারীবাদী সংগঠনগুলোর জন্য উচিত হলো, নারীদের বিচার ও আইনি সেটরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করা। কারণ এব মাধ্যমেই জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কোনো কিছু আরোপ করা সম্ভব। কেবল সহযোগিতা ও দাবি উত্তোলন করার মাধ্যমে নয়;

বরং উক্ত সেক্টরগুলোতে সরব উপস্থিতির মাধ্যমে এই দাবির বিষয়টিকে জোরদার করতে হবে। যেন অন্যান্য নারীরাও এ পথে আসতে সাহস পায়।"

নারীদের বিচারবিভাগে অন্তর্ভুক্তির প্রতি র‍্যাড কর্পোরেশনের আগ্রহের পেছনে বিশেষ কারণ আছে। তারা এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন ও বিধান পরিবর্তন এবং সংশোধনের দাবি অত্যন্ত কার্যকরভাবে তুলতে পারবে।

সমস্ত উলামায়ে কেরাম খলিফা কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়াকে শর্ত করেছেন। তারা সকলেই একমত যে, নারীর জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া বৈধ নয়।

জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের রায় হলো, নারীর জন্য বিচারক ও সাধারণ নেতৃত্বের কোনো পদে অধিষ্ঠিত হওয়াও বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

'পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

আর বাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে জাতি কখনো সফল হবে না, যে জাতি তাদের দায়িত্বের ভার একজন নারীর হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

তা ছাড়া খুলাফায়ে রাশেদিন ও তাদের পরবর্তী সালাফদের কেউই কোনো নারীকে কোনো অঞ্চলের বিচারক কিংবা শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেননি। কারণ একজন বিচারকের জন্য পুরুষদের সাথে নিয়মিত ওঠাবসা করা জরুরি। অথ্য নারীদের এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা তৈরি হতে পারে।

নারীরা সাধারণত সূক্ষ্ম-অনুভূতি ও আবেগসম্পন্ন হয়। তারা সামান্যতেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ গুণগুলো মাতৃত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক হলেও নেতৃত্ব, বিচারব্যবস্থা ও জাতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।" মোটকথা, নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য, উল্লিখিত পদগুলোর দায়িত্ব ও নারীর প্রতি শরিয়াতের। অন্যান্য বিধানের বিবেচনায় ইসলাম নারীকে বিচারক কিংবা সাধারণ নেতৃত্বের বৈধতা দেয়নি।

আফগানে যেসব নারী কৃষি ক্ষেত্রে জড়িত, তাদের বড় একটা অংশকে অনান সেক্টরে বের করে নিয়ে আসার জন্যও র‍্যান্ড কর্পোরেশন তৎপরতার কথা বলেছে। র‍্যান্ড কর্পোরেশন উইমেন এন্ড ন্যাশনাল বিল্ডিং রিপোর্টটি প্রস্তুত করার সময় আফগানিস্তানের প্রায় ৮০ ভাগ নারী কৃষিকাজে জড়িত ছিল। কৃষির মতো একটি উৎপাদনশীল কাজে নারীদের ভূমিকা নিয়ে সংস্থাটি সন্তুষ্ট না। এর বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, তাদের দৃষ্টিতে কৃষিশিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পেশা। এজন্যই আফগান নারীরা রক্ষণশীলতার সাথে এই সেক্টরে কাজ করছে। কিন্তু র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিতে নারীদের উচিত আধুনিক হওয়া এবং আধুনিক সকল সেক্টরে অংশগ্রহণ করা, বিশেষত পুলিশ, পার্লামেন্টারি, বিচারবিভাগ, বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা। র‍্যান্ড কর্পোরেশন কেনই-বা এমনটা কামনা করবে না! এ সেক্টরগুলোতে নারীদের আনার মাধ্যমেই তো ফ্রি-মিস্ট্রিংয়ের পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। যে ফ্রি-মিস্ট্রিংয়ের ছোবলে মুসলিম-সমাজ ও ইসলামি শরিয়াহর বলয়কে দুর্বল করা খুবই সহজ।

দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হলো, কৃষিশিল্পে কর্মরত নারীরা সাধারণত রাজনীতি ও সাংবিধানিক ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের স্বার্থ বাস্তবায়নে কাজ করতে পারবে না। অথচ এই দুটি সেক্টর র‍্যান্ডের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি সেক্টরকে কাজে লাগিয়েই র‍্যান্ড ইসলামি শরিয়াহর বাস্তবায়নকে অনিশ্চিত করতে চায় এবং মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমাদের বিশ্বাস ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এবং তারা এ কাজে যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছে।

সুতরাং র‍্যান্ড কর্পোরেশন চায় মুসলিম নারীদের বিভিন্ন সেক্টরে ঠেলে দিয়ে নিজেদের আদর্শিক ও রাজনৈতিক উপনিবেশ নিশ্চিত করতে। তারা নারীদের এমন সব ক্ষেত্রে অধিকহারে নিয়ে আসতে চায়, যেগুলোকে ইসলামি শরিয়াহ উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য কিংবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে অনুমোদন দেয় না। ইসলাম-সমর্থিত সামাজিক ঐতিহ্য ও প্রথাও সেগুলোকে নিষিদ্ধ বিবেচনা করে।

নারীর কাজের পরিবেশ

র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম নারীদের কাজের জন্য চাকরির বাজারে ঠেলে দিতে চায়, একই সাথে তারা এটাও কামনা করে যে, তাদের কর্মক্ষেত্র যেন ফ্রি-মিক্সিং তথা নারী-পুরুষ সংমিশ্রিত পরিবেশ হয়। বস্তুত নারীর কর্মের ক্ষেত্রে ফ্রি মিক্সিং তাদের একটি কাজ্জিত মৌলিক বিষয়। এজন্য র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের উইমেন এন্ড ন্যাশনাল বিল্ডিং রিপোর্টে আফগান নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও স্বনির্ভরতার সামনে পথের কাঁটা হিসেবে নারীর চলাফেলার ওপর শরিয়াহ কর্তৃক বিধিনিষেধ প্রদানকে দায়ী করেছে। সেই বিধিনিষেধগুলো হলো, মাহরাম ছাড়া চলাফেরা না করা, ফ্রি-মিক্সিং-এর পরিবেশ এড়িয়ে চলা, অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে বাইরে যাওয়া ইত্যাদি। ফলে কোনো নারী নিজে বিক্রিযোগ্য পণ্য উৎপাদন করে নিজে তা বিক্রি করতে পারে না; বরং একজন পুরুষকে বিক্রির দায়িত্ব দিতে হয়। পাশাপাশি রিপোর্টটিতে নারীদের বাজারে যাওয়া ও পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া নিজেই সব ধরনের কাজের ব্যাপারে স্বনির্ভর করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর কথাও বলা হয়েছে।

যদি কাজের পরিবেশের ব্যাপারে আফগানের সামাজিক কাঠামো নিয়ে আপত্তি তোলা হয়, তাহলে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সেখানে নারীদের জন্য আলাদা ব্যবসায়িক মার্কেট তৈরি করে নারী-অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। সাথে সাথে এ প্রচেষ্টাও থাকতে হবে, যেন ধীরে ধীরে এই পার্থক্য কমতে থাকে এবং নারী-পুরুষ একসাথে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে পারে।"

র‍্যান্ড কর্পোরেশন উপরোক্ত পলিসি বাস্তবায়নের জন্য আফগানিস্তানে ঘটা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। যেখানে ধীরে ধীরে ফ্রি-মিক্সিং-এর ব্যাপারটি গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। ২০০৮ সালে NSP (National solidarity programme) এর পক্ষ থেকে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।" কর্মশালায় নারী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে এবং প্রথম দুইদিন তাদের জন্য পৃথক পৃথক বসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তৃতীয় দিন নারী-পুরুষ সকল কর্মীদের একসাথে বসার নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং দায়িত্বশীল একজনের বক্তব্য উল্লেখ করা হয় যে, এই বিষয়টি বড় কোনো পরিবর্তন আনবে না। তবে এর মাধ্যমে সবাই শিখতে পারবে যে, নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কীভাবে একসাথে কাজ করতে পারে।

এ ঘটনা উল্লেখের পূর্বে র‍্যান্ড কর্পোরেশন রিপোর্টটিতে NSP এর একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছে। সেটা হলো, NSP এর কার্যক্রম থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, দীনি ও সামাজিক মাপকাঠি অক্ষুণ্ণ রেখেই জেভার ইকুয়ালিটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব।" প্রকৃতপক্ষে এটি সুস্পষ্ট

ভ্রান্তি ও অসম্ভব বিষয়। কারণ পশ্চিমা জেল্ডার ইকুয়ালিটি (নারী পুরুষের সমতা) নীতি ইসলামের নীতিমালার সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক। শরয়ি কিছু ইবাদাত, আজর-আজাব ও মনুষ্যত্বের জায়গা ছাড়া ইসলাম সার্বিকভাবে নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে না। ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম, সাধারণ সমতার নয়। কারণ সাধারণ সমতা অন্যায় ও জুলুমের অপর নাম মাত্র।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন ফ্রি-মিক্সিংকে জেল্ডার ইকুয়ালিটির একটি প্রতীক হিসেবে দাবি করে। এটি ইসলাম ও বিভিন্ন মুসলিম দেশের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক বিষয়। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে ফ্রি-মিক্সিংকে হারাম করেছে। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম স্ত্রীদের ব্যাপারেই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যখন তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইতে যাবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাবে। এটি তোমাদের ও তাদের সকলের অন্তরের জন্যই পবিত্রময়।(সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রেখে কথিত জেল্ডার ইকুয়ালিটি বাস্তবায়নের দাবি সম্পূর্ণ অমূলক। মূলত তারা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য প্রাথমিকভাবে এ ধরনের কথাবার্তা বলে। কিন্তু যখন তারা সমাজের গভীরে চলে যাবে এবং সমাজও তাদের আদর্শের গভীরে ডুবে যাবে, তখন তারা তাদের আসল চেহারা প্রকাশ করবে। সেটা হলো, জেল্ডার ইকুয়ালিটি পাশ্চাত্য সভ্যতা কিংবা ধর্মের একটি মৌলিক আকিদা বা বিশ্বাস। যা কিছু এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক হবে, তা কোনো প্রকার যুক্তিতর্ক ছাড়াই প্রত্যাখ্যাত হবে। সেটা ইসলামের অকাট্য বিধান কিংবা জনগণের ঐতিহ্যবাহী কোনো সংস্কৃতিই হোক না কেন।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন নারীর চলাফেরার ওপর শরিয়তের যেসব বিধিনিষেধের দিকে ইঙ্গিত করেছে, যেমন মাহরাম ছাড়া সফর না করা, ফ্রি-মিক্সিং না করা, এগুলো মোটেই নারীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। ইসলাম এ বিধানগুলো নারীর নিরাপত্তা ও উপকারার্থেই প্রদান করেছে। অনেক পুরুষ তাদের সকল কাজ নিজে সম্পাদন করে না; বরং অনেক কাজ তারা দায়িত্বশীল কর্মী নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে করে। তা সত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থনৈতিক সকল কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালনা করেছে। সুতরাং ফ্রি-মিক্সিং করতে না পারা, মাহরাম ছাড়া সফরে বের না হতে পারা, এগুলো কখনোই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রতিবন্ধক নয়। র‍্যান্ড কর্পোরেশনের এমন দুর্বল দাবির মধ্য দিয়ে তাদের আড়ালের উদ্দেশ্যটা আরও স্পষ্ট হয়। সেটা হলো, পশ্চিমা সভ্যতাকে মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। নারীর অধিকার আদায় কিংবা উন্নতি সাধনে তারা মোটেও সৎ নয়।

সামাজিক গঠন ও রাষ্ট্রীয় গঠন এবং দীনের জন্য ফ্রি-মিক্সিং খুবই ধ্বংসাত্মক একটি বিষয়। ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফ্রি-মিক্সিংয়ের বিস্তার সমাজের সকল অনিষ্টের মূল। জমিনে আল্লাহর সাধারণ আজাব নেমে আসার অন্যতম কারণ ফ্রি-মিক্সিং। সাথে সাথে সমাজের সাধারণ থেকে বিশেষ সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ারও একটি কারণ ফ্রি-মিক্সিং। এর মাধ্যমে সমাজে ব্যাপকহারে অশ্লীলতা ও যিনা ছড়িয়ে পড়ে। যদি দায়িত্বশীল ব্যক্তির বুদ্ধিতে পারত যে, এটা দীনের পাশাপাশি সমাজ ও সমাজের লোকদের জন্য কতটা ক্ষতিকর, তবে তারা কঠোরভাবে ফ্রি-মিক্সিংকে নিষেধ করত।'।

ফ্রি-মিক্সিং ও নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন সভ্যতার পতনেরও একটি মৌলিক কারণ। ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত যে, গ্রীক সভ্যতার পতনের অন্যতম একটি কারণ ছিল নারীদের খোলামেলা চলাফেরা, সৌন্দর্য প্রদর্শন ও ফ্রি-মিক্সিং। রোম সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে।

ডক্টর সুলাইমান আল ইদি খুব চমৎকার কথা বলেছেন। সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় উপনিবেশই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মুসলিম দেশগুলোতে ফ্রি-মিক্সিং ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জোর চেষ্টা চালিয়েছে। এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামি সমাজের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংস করা, মুসলিম-সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এবং মুসলিম-সমাজকে নিজেদের অনুগত বানিয়ে তার ওপর ইসলামবিরোধী সকল চিন্তাধারা ও প্রথা চাপিয়ে দেওয়া। কারণ সমাজ, পরিবার ও মুসলিমদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করার ক্ষেত্রে ফ্রি-মিক্সিং ভয়াবহ প্রভাব ফেলে।

এমনকি ফ্রি-মিক্সিংয়ের দিকে আহ্বান ও ইহুদিবাদী জায়োনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেও গভীর সম্পর্ক আছে। তাদের অন্যতম একটি পরিকল্পনা ছিল, যৌনতা, পর্নোগ্রাফি ও চারিত্রিক বিকৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামি সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া। এজন্য ২০০২ সালে ইসরাইলি সৈন্যরা যুদ্ধ চলাকালে ফিলিস্তিনে রামাল্লার সকল মিডিয়া স্টেশন দখল করে নেয় এবং প্রত্যেক চ্যানেলে একযোগে পর্নোগ্রাফি প্রোগ্রাম সম্প্রচার করে।

পৃথিবীর ঐতিহাসিক ধারা, মুসলিম উলামায়ে কেরামের বক্তব্য ও পশ্চিমা কিছু গবেষকদের দাবি এই ব্যাপারে নিশ্চিত বার্তা দেয় যে, নারীদের অবাধ চলাফেরা ও ফ্রি-মিক্সিং রাষ্ট্রের অনেক সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী। এমনকি বিভিন্ন প্রকার শান্তির সম্মুখীন হওয়া ও সভ্যতায় পঁচন ধরার ক্ষেত্রেও ফ্রি-মিক্সিং ভয়াবহ ভূমিকা রাখে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত

নয় প্রাচ্যবাদী কিংবা পশ্চিমা কিছু সংস্কার আহবানে সাড়া দিয়ে ফ্রি-মিক্সিংয়ে জড়ানো। এরা কখনো আমাদের কল্যাণ চায় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ

'আহলে কিতাবদের একদল চায় তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯)

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পুরো রিপোর্ট থেকে এই কথা বারবার সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে নারী-অধিকারের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। 'নারী-অধিকার' এই কথাটিকে তারা কেবল একটি সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর এই সাইনবোর্ডের আড়াল থেকে তারা নারীদের উন্মুক্ত বাজারে ছেড়ে দিয়ে সমাজে যৌনতাকে উস্কে দিতে চায়। নারীদের ভোগ্যপণ্য বানিয়ে সমাজে যৌনবিপ্লবকে সফল করতে চায়। যেন নারী-পুরুষ উভয়কেই যৌনতায় উন্মাদ রেখে লিবারেলিজম, ফেমিনিজমের মতো পশ্চিমা ধর্মে খুব সহজেই দীক্ষিত করতে পারে। আমরা দেখেছি, তারা নারীদের জন্য এমন কোনো কর্মপদ্ধতির প্রস্তাব রাখেনি, যেটা তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই হবে, যেই পদ্ধতি ও পরিবেশ তাদের দীন, সম্মান ও পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।

পক্ষান্তরে ইসলামি শরিয়াহ নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য, তার যোগ্যতা ও মর্যাদার স্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়ার পর তার স্বভাব-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে এবং তার এই স্বভাব-প্রকৃতি জীবনের কোন কোন কাজ বা কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত তা সুনিপুণভাবে নির্ণয় করেছে। অতঃপর যে কাজ বা কর্মক্ষেত্র তার স্বভাব-প্রকৃতির পরিপন্থী ও অনুপযোগী, কিংবা সমাজে তার স্বভাবসুলভ ভূমিকা পালনের পথে অন্তরায়, সেই কাজ ও কর্মক্ষেত্র থেকে তাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছে। এই কারণেই পুরুষের তুলনায় তার ওপর কিছু কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে, আবার কিছু দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছে।

ইসলামি শরিয়াহ যখন নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে তখন তার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত মহৎ ও পবিত্র। হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তোষামোদ কিংবা নারীত্বকে শোষণ ও ব্যবহার করার নোংরা মানসিকতা তার ছিল না। অথচ গ্রীক, রোমান ও আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা তাকে যত্রতত্র বিচরণ, অবাধ মেলামেশা ও ঢলাঢলিতে নামিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, তার

নারীত্বকে নষ্ট করা ও ভোগ করা এবং তাকে রাজনৈতিক ও উপনিবেশের স্বার্থ বাস্তবায়নের হাতিয়ার বানানো। তার অধিকার ও মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

পক্ষান্তরে ইসলাম ঠিক এর বিপরীত ভূমিকা পালন করেছে। ইসলাম নারীর জন্য সে বিধানই দিয়েছে যা তার যথার্থ মর্যাদা নিশ্চিত করে। ইসলাম পুরুষের সাথে মেলামেশা ও সভাসমিতিতে বিচরণের ব্যাপারে নারীর ওপর কঠোরতা আরোপ করেছে। কেননা ইসলাম চায় পরিবার ও সমাজের কল্যাণ সাধন করতে, নারীর ইজ্জত-সম্মতিকে নিরাপদ ও তার নারীত্বকে শোষণমুক্ত করতে।

এজন্য মুসলিম নারীদের উচিত বিশ্বের সকল নারীর সামনে গর্ববোধ করা। কারণ তার অনুসৃত ইসলামি শরিয়াহ ও সভ্যতা দুনিয়ার সকল আইন ও সভ্যতার তুলনায় তাকে সবার আগে নিঃস্বার্থভাবে অধিকার প্রদান করেছে এবং তার মনুষ্যত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এই অধিকার ও স্বীকৃতি দিতে গিয়ে ইসলাম তার নারীত্বের বিন্দুমাত্র অবমাননা করেনি এবং তাকে কোনো স্বার্থ কিংবা জোরজবরদস্তির কালিমাও স্পর্শ করেনি।

নারীর কাজের ব্যাপারে র‍্যান্ডের অবস্থান ও তার পর্যালোচনা

র‍্যান্ড কর্পোরেশন নারীর চাকরি ও তার উপকারিতা-অপকারিতা নিয়ে দলিলভিত্তিক কোনো পর্যালোচনা দিতে পারেনি। (প্রতিটি সংস্থাই এরকম) বরং তাদের বক্তব্যগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সাথে মিলে যায়। তারা চায়, তাদের পলিসিগুলো যেন রাজনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো গ্রহণ করে নেয়। মুসলিম নারীদের কর্মের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গি জাতিসংঘের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সূচনালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ নারীদের অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করে আসছে।

কোনো প্রকার শর্ত ও বিধি ছাড়াই র‍্যান্ড নারীদের যেভাবে চাকরির বাজারে নেমে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, এটা কখনো বস্তুনিষ্ঠ কোনো রিপোর্ট ও গবেষণাধর্মী কাজ হতে পারে না। তারা তাদের গবেষণায় নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র ঞ্ক্ষেপ করেনি। একজন নারী সর্বপ্রথম ঘরে রাণী এবং শিশুদের কোমল পাঠশালা। এ দায়িত্বই তার স্বভাবজাত মৌলিক দায়িত্ব। এ বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়ার ভান করে কোনো গবেষণাই একাডেমিক মানে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। সে গবেষণা নিশ্চিতভাবেই নারীর ওপর, শিশুদের ওপর ও পুরো সমাজের ওপর জুলুম চাপিয়ে দেবে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পুরো রিপোর্টে নারী-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে একাডেমিক কোনো পর্যালোচনা নেই, নেই বস্তুনিষ্ঠ কোনো আলোচনা। পুরো রিপোর্টে তারা নির্দিষ্ট কিছু সংশয়, দাবি ও পলিসি মুসলিমদের ওপর চাপিত্রে দিতে চেয়েছে। আরও পরিষ্কার করে বললে, তারা সেই পুরোনো মদই নতুন বোতলে মুসলিমদের গিলাতে চেয়েছে। উপনিবেশ আমলে পশ্চিমা বিশ্ব যেসব সংশয় মুসলিম নারীদের উদ্দেশ্যে আমদানি করেছে, সেগুলোই র‍্যান্ড গবেষণার নামে বুদ্ধিজীবী ভাব নিয়ে পলিসি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। প্রাচীন সেই ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যগুলোই তারা বর্তমান যুগের ভাষায় তুলে ধরেছে।

পাশাপাশি সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং সেটা দূরীকরণের পন্থাও বাতলে দিয়েছে।

মূলত আধুনিক প্রাচ্যবাদ তার পুরো কার্যক্রমে প্রাচীন অসৎ প্রাচ্যবিদদের ওপরই নির্ভরশীল। ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল কেন্দ্রবিন্দু একই। কালের পরিক্রমায় প্রয়োজন অনুপাতে তারা কেবল সেই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পলিসি গ্রহণ করে।

নারীর কর্মের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশন মোটাদাগে যে দাবিগুলো যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে, সেগুলো হলো:

১. অর্থনৈতিকভাবে নারীসমাজকে এড়িয়ে গেলে দেশের অর্ধেক জনসম্পদকে নষ্ট করা হয়।

গৃহস্থলের পরিবেশে নারীর কর্মের মাধ্যমে কখনোই অর্থনীতিতে নারীকে পশ্চাতে ফেলে রাখা হয় না এবং এর মাধ্যমে দেশের অর্ধেক জনশক্তি নষ্টও হয় না; বরং একজন নারী পারিবারিক পরিবেশে থেকে দেশের জনশক্তিকে প্রস্তুত ও শাণিত করে তোলে। নারীর এই ভূমিকা খুবই প্রাণবন্ত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা দেশের পূর্ণ জনশক্তিকে উৎপাদনশীল ও গঠনমূলক করে তোলে। যদি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীকে উৎপাদন সেক্টরে কাজে লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশনাকে তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকি ছাড়া কিছুই মনে করবে না। এই নির্দেশনা মানতে গেলে প্রতিষ্ঠান নিম্নেই ক্ষতিগ্রস্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কারণ উৎপাদনের জন্যও একটি অগ্রগামী টিম থাকতে হয়, যারা বিভিন্ন পরিচালনা পর্যদকে দেখভাল করবে। যেমন: হিসাব বিভাগ, প্রচারণা বিভাগ, মার্কেটিং বিভাগ, কাঁচামাল বিভাগ, শ্রমিক বিভাগসহ অনেক সেক্টরে কাজ করতে হয় একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে। আর পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকেও বেশি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে বস্তুগত সহায়তার পাশাপাশি মানসিক ও অনুভূতিগত প্রতিপালন ও সহায়তার প্রয়োজন হয়। যা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনায় নেই; বরং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরও উক্ত সহায়তাগুলো পারিবারিক প্রতিষ্ঠান থেকেই আহরণ করে থাকে।

সুতরাং পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশের পুরো জনশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর সকল নারীকে বস্তুগত উৎপাদনে নামিয়ে আনা মূলত পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার নামান্তর। একটি শিল্পকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা বিলুপ্ত হওয়ার চেয়ে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য বেশি বিপজ্জনক। উপার্জন ও পরিবারের বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ পুরুষের দায়িত্ব, আর ঘর ও পরিবারকে ভেতর থেকে প্রতিপালন করা নারীর দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বণ্টননীতি যদি সংরক্ষিত রাখা যায়, তবে সমাজ আল্লাহর ইচ্ছায় একটি শক্তিশালী, উৎপাদনশীল ও গঠনমূলক প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে পারবে। এই সুসম দায়িত্ব বণ্টননীতি সমাজের বর্তমান ভারসাম্যকে বজায় রাখবে এবং ভবিষ্যতের উপার্জনকে নিশ্চিত করবে। আর যদি এই দায়িত্ব বণ্টননীতি লঙ্ঘন করা হয়, তাহলে সমাজ

ও সভ্যতার বিদ্যমান ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং তার ভবিষ্যতের ওপরও বিরাট নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আবার যদি কোনো প্রতিষ্ঠানকে তাদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের দায়িত্বের মাঝে অদলবদল করতে বলা হয় এভাবে যে, প্রত্যেক বিভাগই বিরতি দিয়ে দিয়ে একে অপরের বিভাগের দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ এ সপ্তাহে যারা উৎপাদন বিভাগে কাজ করেছে তারা আগামী সপ্তাহে মার্কেটিং সাইটে কাজ করবে। আবার যারা মার্কেটিং সাইটে ছিল তারা উৎপাদন বিভাগে চলে আসবে। এভাবে প্রতিটি সেক্টরের কর্মীরা দায়িত্ব অদলবদল করবে। এ ব্যবস্থাপনাকেও প্রতিষ্ঠানটি

ক্ষতিকর ও হুমকি হিসেবে দেখবে। প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদেরই নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা আছে, যেটা স্ব স্ব বিভাগের জন্য উপযোগী। অন্য কোনো বিভাগের জন্য সেসব দক্ষতা উপযোগী নয়। ফলে কর্মীদের যখন তাদের উপযুক্ত কর্মস্থল থেকে বের করে ভিন্ন কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হবে, তখন প্রতিষ্ঠানটি কয়েক দিনেই লস প্রজেক্টে পরিণত হবে।

কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এই ধারণা করতে পারে না যে, নারীরা কর্মের জন্য ঘর থেকে বের হলেই দেশের পুরো জনশক্তি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে একযোগে তৎপর থাকবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমান সময় অধিকাংশ যুবক ও পুরুষ বেকার ঘুরছে। তাদের কেউ কেউ পরিপূর্ণ বেকার, কেউ কেউ আবার তার যোগ্যতার সাথে উপযোগী কর্মক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছে না। এই বাস্তবতা বোঝার জন্য কোনো পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই। খালি চোখেই বিবেকবানরা এই সত্য প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কর্মের ময়দানটা স্বভাবজাতভাবে পুরুষদের এষ্টিভিটি প্লেস। যখন থেকেই এখানে নারীরা এসে ভিড় করছে, তখন থেকেই পুরুষদের মধ্যে বেকারত্ব অধিকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে পারিবারিক ও নারী-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

২. র্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, নারীর আয়ের অর্থ পরিবারের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় বেশি উপকারিতা সাধন করতে পারে।

প্রথমত, বিভিন্ন পরিসংখ্যান র্যান্ডের দাবির উল্টোটা প্রমাণিত করে। একাডেমিক কয়েকটি গবেষণা দাবি করেছে যে, নারীর কর্মের কষ্টের তুলনায় পরিবার তার আয় থেকে খুব কমই উপকৃত হয়। মিশরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আল মারকাজুল কওমিয়া লিল বুহসিল ইজতিমাইয়্যাহ তাদের এক গবেষণায় জোর দিয়ে বলেছে যে, নারীর আয়ের সর্বোচ্চ ১৮%

অর্থ থেকে পরিবার উপকৃত হতে পারে। অবশিষ্ট আয় তার পোশাক, সাজসজ্জা, জুতা, পরিবহন খরচ ও কর্মজনিত নানান চাহিদাতেই ব্যয় হয়ে যায়।

কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিভাগের শিক্ষক ড. হাদী মুখতার তার এক গবেষণায় দেখিয়েছে যে, নারীর উপার্জনের বড় অংশই সামাজিক প্রদর্শনীতে চলে যায়।

দ্বিতীয়ত, ধরে নেওয়া হলো যে, নারীর আয়ে পরিবারের কিছুটা লাভ হয়। কিন্তু তার আয়ের উপকারিতার চেয়ে সে ঘর থেকে বের হওয়ার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিটা আরও বড় এবং মারাত্মক। সন্তানদের অবহেলা করা, মায়ের যথার্থ প্রতিপালন থেকে সন্তান বঞ্চিত হওয়া, সংসারের ব্যাপারে উদাসীনতা, পারিবারিক দায়িত্ব পালনে শিথিলতা, নিজে ফিতনার সম্মুখীন হওয়া ও অন্যকে ফিতনার সম্মুখীন করাসহ বিভিন্ন দীনি, রাজনৈতিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলোর সামনে উল্লেখিত নগণ্য উপকার কিছুই না। তা ছাড়া ইসলামি ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো, অকল্যাণ দূরীভূত করা কল্যাণ লাভের ওপর প্রাধান্য পাবে।

এই পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সমস্ত তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে, নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া চরিত্র নষ্টের পাশাপাশি পরিবার বিরান হওয়া, পরিজন নষ্ট হওয়া, ভালোবাসা ও দয়া কমে যাওয়ার অপর নাম।

নারীরা ঘর থেকে বের হওয়ার কারণে পশ্চিমা সমাজ যে নরকীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে, তা সম্পর্কে স্বয়ং অনেক পশ্চিমা গবেষকই মুখ খুলেছে।

ব্রিটিশ গবেষক স্যামুয়েল স্মেইল বলেন, 'যে ব্যবস্থা নারীকে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত রাখে, দেশের শিল্পবিপ্লবের জন্য আমাদের দেশে সে ব্যবস্থার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এর ধ্বংসাত্মক এক পরিণতি হলো, পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। কারণ এই ব্যবস্থা পারিবারিক কাঠামোতে আঘাত হানে, এর ভিত্তিসমূহকে ভেঙে দেয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। বিশেষ করে এই ব্যবস্থার একমাত্র পরিণতি হলো, নারীর নৈতিকতা ও চরিত্রকে হীন করে দেওয়া। একজন নারীর প্রধান ও প্রকৃত দায়িত্ব হলো, পরিবারকে ঠিক রাখা।

অর্থনীতিবিদ জাওল সিমেন বলেন, ‘নারীরা এখন অনেক কিছুই করছে। সরকার তাদেরকে কারখানাতেও নিয়োগ দিয়েছে। এভাবে তারা সামান্য কটা পয়সা আয় করতে পারছে বটে, কিন্তু এর বিনিময়ে তারা পরিবারের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিয়েছে।

নিশ্চয় ইসলামি শরিয়াহ নারী-পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়ের মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত এক সমাজব্যবস্থা। নারী-পুরুষের সত্তা ও সমাজের কল্যাণ ইসলামের বিধিবিধানে পূর্ণ বিবেচনা পেয়েছে। দায়িত্বের এমন বণ্টন পরিবার ও সমাজের জন্য আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। এর মাধ্যমেই পরিবার ও সমাজ একটি ভারসাম্যপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করতে পারে।

৩. র‍্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, নারী সদস্যের উপস্থিতি পুলিশি শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বন্দি নারীদের পর্যবেক্ষণ, নারী অপরাধীদের অনুসন্ধানের মতো কাজের জন্য নারী-পুলিশ প্রয়োজন। র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পরিতাপ হলো, আফগান নারীরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে কিংবা স্থানীয় পুলিশ বিভাগেও ব্যাপকভাবে সকল পদে জায়গা করে নিতে পারেনি। কারণ আফগান সরকার ও সমাজ এর বিরোধী।

র‍্যান্ডের এই বক্তব্য স্ববিরোধী। বক্তব্যের প্রথম অংশের সাথে দ্বিতীয় অংশের বিরোধ আছে। যদি নারীবিষয়ক নিরাপত্তার জন্যই নারী পুলিশের প্রয়োজন হয়, তাহলে ব্যাপকভাবে সকল সেকশনে তাদের অংশগ্রহণের দরকার কী? প্রয়োজনীয় সেক্টরে প্রয়োজন অনুপাতে নারী সদস্য থাকাই কি যথেষ্ট নয়?

ইসলামি শরিয়াতে নারীদের সাধারণভাবে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া আছে। এটা ইসলামি শরিয়াতের পক্ষ থেকে নারীদের প্রতি বিশেষ রহমত। এমনকি ইসলাম নারীদের জন্য জিহাদকেও ফরজ করেনি। কেবল জিহাদ যখন ফরজে আইন হয় তখন নারীদের ওপর দায়িত্ব আসে। নারীর শারিরীক, মানসিক ও স্বভাবজাত গঠন সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়। বিশেষত আধুনিক সেনাজীবনে তো নয়ই। এই সেনাজীবন ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। নারীদের মূল কর্তব্য হলো, তারা আড়ালে থাকবে এবং পুরুষদের সাথে মেলামেশা বর্জন করবে। আর যুদ্ধের ময়দান কিংবা আধুনিক সমর কাঠামোতে এটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান যুগে নারীসেনার যেই কাঠামো-ইসলাম এর অনুমোদন দেয় না। কেননা এই কাঠামো ফ্রি-মিক্সিংকে আবশ্যিক করে। তা ছাড়া

সালাফদের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে নারী বাহিনী গঠনের কোনো নজিরও পাওয়া যাবে না। এটি সম্পূর্ণ নব্য আবিষ্কৃত বিষয়।

নারী বন্দিদের পর্যবেক্ষণ, নারী অপরাধীদের অনুসন্ধানসহ নারী সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ নারী টিম গঠন করার বৈধতা আছে। তবে সেটা অবশ্যই শরিয়াতের অন্যসব নীতিমালা মেনে এবং প্রকৃত প্রয়োজন অনুপাতে হতে হবে।

৪. র‍্যান্ড কর্পোরেশনের আরেকটি হাস্যকর দাবি হলো, পুলিশ বাহিনী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠানে নারী সদস্যদের উপস্থিতি পরিচালনাগত নৈরাজ্যকে কমিয়ে আনে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ও তার অবস্থা সম্পর্কে যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে, সে বুঝতে পারবে এই দাবি কতটা হাস্যকর ও অবাস্তব। পরিচালনাগত নৈরাজ্য সাধারণত অন্যান্য কিছু বিষয়ের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর সাথে নারীর অনুপস্থিতির তেমন সম্পর্ক নেই; বরং দেখা যায়, নারীর উপস্থিতির কারণেই অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনাগত নৈরাজ্য দেখা যায়। বিশেষত পুলিশ বিভাগে এই নৈরাজ্যের সংখ্যা আরও বেশি। যেখানে উপরস্থ কর্মকর্তারা নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের ওপর কর্তৃত্ব খাটায়।

সেই ১৯৭৫ সালেই ওয়াশিংটন পোস্ট কিছু রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেখানে বলা হয়, স্বয়ং জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রকরা পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত নারীদের যৌন নির্যাতন করে। যদিও নারী-পুলিশ সদস্য একদিনের জন্য তাদের যৌন লিঙ্গায় অসম্মতি জানায়। মহিলা পুলিশদের একটি সমিতির কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা জানায়, তারা প্রায় সকলেই তাদের উচ্চপদস্থ নেতাদের পক্ষ থেকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে।

যদিও র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের দাবির পক্ষে কিছু অসং ও মেকি রিপোর্ট দেখিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ একাডেমিক রিপোর্টই তাদের বিরুদ্ধে। যেই রিপোর্টগুলো প্রমাণ করে যে, নারীর উপস্থিতির কারণে পরিচালনাগত নৈরাজ্য কমে না; বরং কখনো কখনো বৃদ্ধি পায়।

মূলত নারীর কর্মের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের উইমেন এন্ড ন্যাশন বিল্ডিং নামক রিপোর্টে যেসব দাবি করেছে, তার সবগুলোই অত্যন্ত দুর্বল ও অবাস্তব; বরং প্রতিটি দাবিই ঔপনিবেশিক পলিসি বাস্তবায়ন ও মুসলিম-সমাজকে পাশ্চাত্যকরণের জন্য উদ্দেশ্য

প্রণোদিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই ধরনের রিপোর্টকে কখনো বস্তুনিষ্ঠ ও একাডেমিক বলা যায় না; বরং এটি বিষাক্ত প্রাচ্যবাদী গবেষণার দৃষ্টান্ত।

উপরন্তু নারীর কর্মের ব্যাপারে এমন কিছু বাস্তবতা আছে যেগুলো র‍্যান্ড এড়িয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমা কিছু সংস্থাই সেসব বাস্তবতার কথা স্বীকার করেছে। এর মধ্যে একটি বাস্তবতা হলো, ব্যাপকভাবে নারীদের কর্মক্ষেত্রে আসা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও কমিয়ে আনার একটি মাধ্যম। জাতিসংঘের অধীনে কর্মরত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রাম (NIP) দাবি করেছে যে, কাজের জন্য নারীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সাথে জনসংখ্যার হার কমান সম্পর্ক আছে। যখনই

কর্মশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এর কারণ হলো, নারীদের পরিবার থেকে অমনোযোগী করে চাকরি ও বাইরের ক্যারিয়ারমুখী করে দেওয়ার কারণে তারা সংসার গঠন ও বিয়ে করতে বিলম্ব করছে। দেখা গেছে বর্তমানে দেশে শিক্ষিত ও কর্মজীবী নারীদের বিয়ের গড় বয়স ২৮-৩০। বিয়ের পরও সন্তান গ্রহণের প্রতি এক প্রকার অনীহা কাজ করছে এসব কর্মজীবী নারীদের ভেতর। ফলে একদিকে বয়স বাড়ার সাথে তাদের সন্তান জন্মদানক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে চাকরি ও সংসারের ঝামেলা থেকে বাঁচতে সন্তান নিতেও অনীহাবোধ করছে। যা আশংকাজনকভাবে জনসংখ্যার হারে নিম্নমুখী প্রভাব ফেলছে।

মুসলিম নারীদের পশ্চিমাদের কাতারে নেওয়ার জন্য আকর্ষণ করা

পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম-সমাজের এমন একটি উপাদান তালাশ করে, যা খুব দ্রুত তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করে নেবে। তারা দেখতে পেল, নারীরাই হলো সেই সহজ ও দ্রুতগামী উপাদান। এজন্য তারা মুসলিম দেশগুলোর নারীসমাজকে টার্গেট করল। যেন তৃণমূল পর্যায়ে নারীরা তাদের সহযোগী হতে পারে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের পুরোনো এক রিপোর্টে আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের উপনিবেশ নিয়ে আলোচনা করেছে। রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছিল ডেভিড গ্যালোলা। সে ফ্রান্স উপনিবেশের একজন দায়িত্বশীল ছিল। আলজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নারী এবং আলজেরিয়ার অধিবাসীদের মাঝে থাকা তাদের মিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সে বলে, 'আমি বিশ্বাস করি, আলজেরিয়ার নারীরা যেই অনুগত জীবনযাপন করছে, আমরা যদি তাদের সেই জায়গা থেকে মুক্ত করতে পারি, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা আমাদের পক্ষে কাজ করবে। আমি সেনাবাহিনীর কমান্ডের কাছে একটি চিঠি লিখেছি। সেখানে আমি তাকে বলেছি, আলজেরিয়ান নারীরাই আমাদের সবচেয়ে প্রত্যাশিত সহযোগী

নারীদের সহযোগিতা লাভের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন পলিসি দেখিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো, নারীদের পুরুষদের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া এবং নারী ও পুরুষের মাঝে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা। পরস্পরের প্রতি এই বিয়োগ মনোভাব তৈরি করতে পারলে খুব সহজেই নারীদের তারা নিজেদের দিকে কোঁকাতে পারবে।

ঠিক এই পরিস্থিতিটাই আজকে আমরা সমাজে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। নাই পুরুষ একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক না ভেবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাৱ আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজ থেকে এই ঘৃণ্য মনোভাবকে দূর করতে হবে। এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ একদিকে কিছু পুরুষদের ব্রাহ্মণীবাদী আচরণ নারীদের জুলুমানা মানসিকতায় ভোগাচ্ছে। আর অন্যদিকে তাদের এই বিষণ্ণতার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমা নারীবাদ

ও লিবারেল গ্রুপগুলো নারীদের দীনবিরোধী আদর্শের শিকার বানাচ্ছে।

নারীদের সহযোগী বানানোর ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদীদের আরেকটি পলিসি হলো, নারীদের বিভিন্ন সামাজিক ও চিকিৎসাকেন্দ্রিক সেবা প্রদান করা। এই ব্যাপারে ডেভিড গ্যালোলার অভিমত হলো, ফ্রান্সের একজন সেনাবাহিনী আলজেরিয়াব কোনো এক গ্রামের একজন বিধবা মহিলাকে খাবার দেয়। যার ফলে ওই নারী উক্ত গ্রামে আমাদের গুপ্ত সহযোগী হয়ে যায় এবং সে অনেক গুরুপূর্ণ তথ্য প্রদান ও গোপনীয় অনেক কাজ আমাদের করে দেয়।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের নারী-সংক্রান্ত রিপোর্টটিতে বলেছে, আফগানিস্তানে নারীদের কিছু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান আঞ্চলিকভাবে আমেরিকার জন্য বিভিন্ন সহায়তা লাভের ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। একাধিকবার সেবা গ্রহণকারী নারীবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে এবং আমেরিকান শক্তিকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে তারা নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করেছে। তাদের কেউ কেউ আমাদের কাছে বিভিন্ন কৌশলগত তথ্যও শেয়ার করেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমাদের সামনে যে বিষয়টি ফুটে ওঠে সেটা হলো, বর্তমানে পুরো মুসলিম-সমাজ (এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে। বিশেষত নারীসমাজের মাঝে ওয়ালা-বারা তথা আল্লাহর জন্য সম্পর্ক এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কচ্ছেদ-এর বিশ্বাস অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আমরা যদি মুসলিম-সমাজে আকিদার এই পাঠকে শক্তিশালী করতে পারতাম, তবে পশ্চিমা মুসলিমদের মাঝে প্রবেশের জন্য সহজ কোনো দরজা খুঁজে পেত না এবং মুসলিমদের মাঝে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ফাসাদ ছড়ানোর সুযোগও পেত না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَانٍ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাকো, তবে আমার শত্রুকে এবং তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে। অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসুলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো! অথচ তোমরা যা কিছু

গোপনে করো এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করো, আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হলো।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

'হে মুমিনগণ! ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদের হেদায়াত দান করেন না।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

'আল্লাহ তোমাদের কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা জালেম।

আল্লাহর জন্যই আন্তরিক সম্পর্ক এবং আল্লাহর জন্যই সেই সম্পর্কচ্ছেদের বিশ্বাস মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পশ্চিমাদের সর্বপ্রকার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য এক শক্তিশালী প্রাচীর হতে পারে। কারণ যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দীনের কল্যাণের ভিত্তিতেই সম্পর্ক করবে, সে কখনো ইসলামের শত্রুকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহায়তা করার মতো জঘন্য খেয়ানত করতে পারে না। যে কাফের, মুশরিক ও দীনের শত্রুদের প্রতি আন্তরিক সম্পর্ক রাখবে না, সে কখনো এমন কোনো বিষয় ও ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করবে না, যেটা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির কারণ হবে। বারাতের বিশ্বাস তাকে এই কাজ করতে বাধা দেবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো, গর্ভে ধারণ করা সন্তানের দুনিয়ায় আগমনকে বাধাগ্রস্ত করা কিংবা বিলম্বিত করা।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টে জন্মনিয়ন্ত্রণের মর্ম হলো, গড়ে প্রত্যেক পরিবারের দুই সন্তানের অধিক সন্তান না থাকা।

যারা মানব সন্তানকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশবৃদ্ধির জন্য বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা অধিক প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানদানে সক্ষম মেয়েকে বিয়ে করো। কারণ আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের অধিকসংখ্যক উম্মত নিয়ে গর্ব করব।'

সুতরাং অধিক সন্তানগ্রহণ সত্তাগতভাবে একটি কাম্য বিষয়। অধিক সন্তানলাভ ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের অন্যতম একটি মহান উদ্দেশ্য। আবার এটি মানব ফিতরাতেরও চাহিদা। মানব-সম্পদ যেকোনো জাতির জন্য সবচেয়ে দামি সম্পদ। সংগ্রাম ও লড়াইয়ে এই সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমা অনেক দেশ আজ মানব-সম্পদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। কারণ মানব-সম্পদ একটি সভ্যতা গঠনের জন্য প্রধান ভিত্তি। এজন্য এই দেশগুলো তাদের মানব-সম্পদ বৃদ্ধি ও উন্নত করার আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি সন্তান জন্ম দেওয়ার ওপর তারা জন্মদাতা মায়ের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কারেরও ঘোষণা দিয়েছে এবং তিনের অধিক সন্তানদানকারী মায়ের জন্য পুরস্কারের পরিমাণ বেশি ধার্য করেছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণে কোনো জাতি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকলে তারা একসময় অস্তিত্ব সংকটে ভুগবে। উদাহরণস্বরূপ যখন সেই জাতির মাঝে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে কিংবা অন্য কোনো জাতির সাথে তাদের যুদ্ধ লেগে যায়, তখন তারা আকস্মিকভাবেই পুরুষ ও মানব-সংকটে পতিত হবে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন ঘনবসতি-সম্পন্ন মুসলিম দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়েও তাদের উপনিবেশবাদী গবেষণা পেশ করেছে। যেমন: মিশর, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে তাদের পৃথক পৃথক গবেষণা আছে। নিম্নে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সেই গবেষণাগুলোর ভাষ্য দেখে নিতে পারি।

১. মিশর

২০০১ সালে র‍্যাড কর্পোরেশন থেকে আরবি ভাষায় মিশরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম ছিল 'আন নুমুউস সুক্কানিয়া ফি মিশর : সিয়াসাতুন তাহিদু মুসতামিররাতান'। সেই রিপোর্টটিতে তারা বিগত অর্ধ শতাব্দীতে মিশরে জন্মদানক্ষমতার হার নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ পেশ করে। দেখা যায় ১৯৯৮ সালে এসে মোট হার নারীপ্রতি ছয়-সাতজন সন্তান থেকে তিন-চারজনে নেমে এসেছে। আশঙ্কা করা হয়, ২০২০ সালের শুরুতে এই হার নারীপ্রতি দুই সন্তানে নেমে আসবে।

র‍্যাড কর্পোরেশনের দৃষ্টিতে মিশরে জন্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তোলার অন্যতম কারণ হলো, বাচ্চা জন্মদানে উর্ধ্বগতি দেশটির ওপর বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা হয়ে দেখা দেবে। তা ছাড়া এটা নারী ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যজনিত আশঙ্কা বাড়িয়ে দেবে। শিক্ষার সুযোগ, খাদ্যের জোগান ও কর্মের ব্যবস্থার ওপরও জন্মহার প্রভাব ফেলবে। তবে যদি জন্মহারকে নিম্নমুখী করা যায়, তাহলে এই আশঙ্কাগুলো কমে যাবে। পাশাপাশি মাথাপিছু আয়ও বেড়ে যাবে।

রিপোর্টটিতে তারা উল্লেখ করে যে, মিশরে জন্মনিয়ন্ত্রণ সফল হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম ও ব্যবস্থাগুলো ব্যাপক ও সহজলভ্য হয়ে ওঠা। ১৯৭৫ সালে আমেরিকান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো বিস্তার করার দায়িত্ব নেয়। পাশাপাশি এজেন্সিটি জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন রিসার্চ ও প্রবন্ধ প্রকাশেরও দায়িত্ব নেয়, যা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রজেক্টে মৌলিক ভূমিকা রাখে। র‍্যাড কর্পোরেশন উক্ত রিপোর্টে পরামর্শ দিয়ে বলে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলোর ব্যবহারকে আরও ব্যাপক করে তুলতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, র‍্যাড কর্পোরেশন উক্ত রিসার্চ প্রস্তুতের জন্য মিশরি নাগরিক মিল্লি খলিফাকেও তাদের দুইজন গবেষকের সাথে অংশগ্রহণ করিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা মূলত সরাসরি মাঠপর্যায়ে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অনুমোদন নিয়ে নিয়েছে।

২. পাকিস্তান

১৯৯০ সালে পাকিস্তান সরকার একটি প্রজেক্ট হাতে নেয়। সেই প্রজেক্টে পাকিস্তান সরকার কিছু নারী শিক্ষিকার সাথে বসে। তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যম সাথে নিয়ে গ্রামীণ নারীদের বাড়িতে পরিদর্শক হিসেবে যাওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। র‍্যান্ড কর্পোরেশন পাকিস্তানকে নিয়ে বানানো রিপোর্টে এই কর্মসূচিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ফোকাস করেছে এবং এর প্রশংসা করেছে।

রিপোর্টটিতে তারা ইঙ্গিত দিয়েছে যে, পাকিস্তান সরকারের এই প্রজেক্ট দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধিতে কিছুটা সফল হয়েছে।

রিপোর্টটি পাকিস্তানে পরিবার পরিকল্পনা নামক প্রজেক্টেরও প্রশংসা করেছে।

যদিও জিয়াউল হক রহিমাহুল্লাহর সরকারের আমলে এই প্রজেক্ট অনেকটা কোণঠাসা ছিল। তথাপি এই প্রজেক্ট তার নতুন পরিকল্পনায় জন্মদানের হারকে সীমাবদ্ধ করা এবং ২০২০ সালের ভেতর রিপ্লেসমেন্ট লেভেল তথা প্রত্যেক বাবা-মা প্রতি দুইজন সন্তানের সীমায় জন্মদানের হার নামিয়ে আনার টার্গেট গ্রহণ করে। র‍্যান্ড কর্পোরেশন রিপোর্টটিতে দাবি করে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় জন্মদানের হার কমে যাওয়ার কারণে পাকিস্তানের প্রত্যেক সদস্যের মাথাপিছু আয়, শিক্ষা ও নগরসুবিধা বেড়ে গেছে।

পাশাপাশি তারা পাকিস্তানের জনসম্পদকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসচেতন খাতে অর্থ ব্যয়ের পরামর্শ প্রদান করে। আর স্বাস্থ্য সচেতনতার ভেতর জন্মনিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।

রিপোর্টটিতে র‍্যান্ড কর্পোরেশন পাকিস্তানে আমেরিকান প্রজেক্টের সহযোগী রাষ্ট্রের কার্যক্রম নিয়েও আলোকপাত করে। এর মধ্যে ২০০৩ সালে ব্রিটেন সামাজিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলোর ব্যবহারকে ব্যাপক করতে প্রায় ১২ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে।

র‍্যান্ড মনে করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে আনা ভবিষ্যতে সরকারের জন্য অনেক সহায়ক হবে এবং জনসেবামূলক কাজের চাপকে হালকা করবে। পক্ষান্তরে এই হার যদি

দ্রুত বর্ধমান হয়, তাহলে এটা ভবিষ্যতে সরকারের জন্য বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও হুমকি তৈরি করবে।

উক্ত রিপোর্টে র‍্যান্ড কর্পোরেশন আরেকটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে, পাকিস্তানে নারীদের অধিক সময়ের জন্য পড়ার সুযোগ পাওয়া জন্মদানের হারকে হ্রাস করতে ভূমিকা রাখছে। এজন্য তারা মনে করে, জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়া পাকিস্তান সরকারের জন্য কল্যাণকর হবে এবং তা ভবিষ্যতের অনেক চাপকে হালকা করবে।

রিপোর্টটিতে র‍্যান্ড তরুণীদের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নারীশিক্ষাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত করে দেখিয়েছে এবং নারীশিক্ষাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম ব্যবহারে অধিক সম্ভাবনা তৈরিকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তাদের বক্তব্য হলো, নারীদের জন্য শিক্ষার অধিক সম্ভাবনা তৈরি হওয়া একই সাথে তাদের জন্মদানের হারকে নিম্নমুখী করবে এবং তার চেয়েও বেশি তাদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনার সেবা গ্রহণের মানসিকতা তৈরি করবে।

র‍্যান্ডের এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পশ্চিমারা যে নারীশিক্ষার দাবি তোলে, তার উদ্দেশ্য কখনো নারীদের তাদের প্রকৃত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া নয়; বরং তারা যে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার দাবি তোলে, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের উপনিবেশবাদী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে। এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তারা তাদের উপনিবেশবাদী স্বার্থে নিবেদিত সেবক তৈরি করে থাকে। এজন্যই তাদের কাছে নারীর শিক্ষার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সে কোন পরিবেশে শিক্ষা লাভ করছে এবং সে তার শিক্ষা দিয়ে তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কতটুকু সেবা করছে। সে শিক্ষা লাভের পর পশ্চিমা সংস্কৃতি ও স্বার্থ বাস্তবায়নে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে।

কোনো নারী যদি সাধারণ জ্ঞানলাভের পর তার পরিবার গঠন ও প্রজন্ম গড়ার শিক্ষা লাভ করে, তাহলে সেই নারী পশ্চিমাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে বিবেচিত হবে না। কোনো নারী যদি শিক্ষালাভের পর কর্মক্ষেত্রের অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে দূরে থেকে তার পরিবারে নিজ শিক্ষার আলো ছড়ায়, তাহলে সেই নারীও পশ্চিমাদের কাছে শিক্ষিত হিসেবে পরিগণিত হবে না। কারণ এই শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের ঘর থেকে বের করে পরিবারকে বিরান করার যে পশ্চিমা স্বার্থ রয়েছে, তাতে ওই নারী কাজে লাগছে না। তাদের কাছে একজন নারী তখনই শিক্ষিত হবে, যখন সে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ, পশ্চিমা আদর্শ গ্রহণ ও পশ্চিমা স্বার্থ বাস্তবায়ন করবে।

৩. মালয়েশিয়া

২০০৩ সালে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের তিনজন গবেষক মিলে মালয়েশিয়াতে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। উক্ত রিপোর্টে তারা মালয়েশিয়ায় ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি তারা এটাও জানার চেষ্টা করেছে যে, কী কী কারণে মালয়েশিয়ার দম্পতির জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রজেক্টে অবহেলা প্রদর্শন করেছে। কোন কোন বিষয় তাদের মাঝে প্রভাব ফেলেছে। শিক্ষা, শিশুদের মৃত্যু, মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট যা বৃহৎ পরিবার গঠনে উৎসাহিত করে, নাকি অন্য কিছু।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পেছনে র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের রিপোর্টগুলোতে যেসব দাবি, যুক্তি ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছে, যেমন: মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়া, দেশের সম্পদ ও অর্থনীতি সমৃদ্ধ হওয়া, সরকারের চাপ কমা-এগুলো কোনো একাডেমিক আলাপ নয় এবং এই দাবিসমূহের কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ভিত্তিও নেই। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রজেক্টের পেছনে পশ্চিমা দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যে অর্থ ব্যয় করেছে, তারা যদি সে অর্থ উল্লিখিত দাবিগুলোর পেছনে ব্যয় করত, তবে সেটা আসলেই কল্যাণকর হতো। যা-ই হোক, আমরা এখন জন্মনিয়ন্ত্রণের পেছনে র‍্যান্ড কর্পোরেশন যে দাবিগুলো উপস্থাপন করেছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

১. র‍্যান্ড কর্পোরেশনের প্রথম যুক্তি হলো, জন্মহারের উর্ধ্বগতি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং খাদ্য ও কর্ম-সম্ভাবনার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তাদের অনাগত বংশধরদের রিজিকের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। এজন্য পবিত্র কুরআনে তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের বর্তমান দরিদ্রতা ও ভবিষ্যতের আশঙ্কামূলক দরিদ্রতার রিজিকের ব্যবস্থাপনা তিনি করে রেখেছেন। তিনি বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

‘ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি। তিনি তাদের স্থায়ী ঠিকানাও জানেন এবং সাময়িক ঠিকানাও। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

এই দায়িত্ব নেওয়ার ফলে তিনি দরিদ্রতার আশঙ্কায় সন্তান হত্যাকে নিষেধ করেছেন। সুরা আনআমের ১৫১ নং আয়াতে ও সুরা ইসরার ৩১ নং আয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। সুতরাং দরিদ্রতার আশঙ্কা কখনো জাতীয়ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কারণ হতে পারে না। এমনভাবে সন্তানের আধিক্য কখনো দেশের কর্ম সম্ভাবনা, খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা হতে পারে না; বরং জনশক্তি মূলত এগুলোর ভিত্তি। চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশ হওয়া সত্ত্বেও শিল্প ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিক থেকে বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চীন।

যারা পশ্চিমাদের অন্ধ অনুসরণ করে না এবং বিকৃত চিন্তা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে না, এমন অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের মত হলো, জনসংখ্যা নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সম্পদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উৎস হলো জনশক্তি। এমনকি তারা এও বলেছে যে, যদি ১০ বছরের জন্য কোনো দেশে শিল্প পরিকল্পনা যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, তবে কর্মক্ষেত্রগুলোতে জনসংখ্যার থেকেও অধিক কর্মীর প্রয়োজন হবে। জমিনে কোনো সংকীর্ণতা নেই এবং কর্মসংস্থানেও কোনো বেকারত্ব নেই। দোষ মানুষের পরিচালনার।

এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি কারিগরি জ্ঞান ও তার ব্যবহারের সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধ করে। তা ছাড়া জনশক্তিকে যদি ইতিবাচকভাবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে তাদের মধ্য থেকেই নতুন নতুন যুবশক্তি বেরিয়ে আসবে। যারা দেশ ও জনগণের বিদ্যমান অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তারা কর্ম ও আবিষ্কারে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। যা সমাজের উন্নতিকে আরও দ্রুতগামী করবে। বিখ্যাত মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনও এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, অধিক জনসংখ্যা অধিক কর্মসংস্থানের দিগন্ত উন্মোচন করে এবং এখানে সৃজনশীলতা ও বহুত্ব নিয়ে আসে। যার ফলে তা দেশের সম্পদ, অর্জন, শক্তি ও সুখ বৃদ্ধি করে। এমনকি পশ্চিমা কিছু গবেষকও এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেছে।

জনসংখ্যার সমৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক সংকটের জন্য দায়ী করা একাডেমিক ফ্যালাসি। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর ঐতিহাসিক বাস্তবতাও এই দাবিকে অস্বীকার করে; বরং জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে জনসংখ্যার যে স্বল্পতা তৈরি হয়, সেটাকে অর্থনৈতিক মন্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ নবজাতক জনসংখ্যা নিম্নমুখী হওয়ার ফলে উৎপাদক জনগোষ্ঠীর থেকে ভোক্তা জনগোষ্ঠী বিশাল ব্যবধানে কমে যায় এবং এতে জিনিসের ডিমান্ড কমে, উৎপাদকদের কর্মসংস্থানও সংকুচিত হয়ে আসে।

মূলত আল্লাহর জমিন কল্যাণে ভরপুর। জমিনের প্রাণীর সংখ্যা যতই হোক, জমিনে যেই পরিমাণ খাদ্য আল্লাহ তাআলা বোঝাই করে দিয়েছেন, তা সকল প্রাণীর জন্যই যথেষ্ট হবে। এই বিশ্বাস না রাখা মূলত আল্লাহর রুহুবিয়্যাতের সাথে সাংঘর্ষিক এবং এটি তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فُلْ أَبْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُندَادًا

ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ.

'বলে দাও, সত্যিই কি তোমরা সেই সত্তার সাথে কুফরি পন্থা অবলম্বন করছ, দুদিনে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তার সাথে অন্যকে শরিক করছ? তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক!

আর তিনি তার উপরিভাগে দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে বরকত দিয়েছেন এবং তাতে (বসবাসকারী) সকল রিজিক-প্রত্যাশীদের জন্য সুষমভাবে রিজিক সৃষ্টি করেন (আর এ সবকিছু তিনি করেন) চার দিনে।' (সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৯-১০)

কুরআন-সুন্নাহ থেকে উদঘাটিত মাকাসিদে শরিয়াহ এই কথার প্রমাণ করে যে, ইসলাম অর্থনীতিকে জনসংখ্যা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলে, অর্থনীতি অনুযায়ী জনসংখ্যাকে নয়।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন-যারা নিজেদেরকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের অগ্রদূত মনে করে-তারা কি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্য জন্মের পূর্বেই নবজাতককে কবর দেওয়া ছাড়া আর কোনো সমাধান খুঁজে পেল না? এটা কি তাদের রাজনৈতিক ও পরিচালনাগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা? কখনোই না; বরং বাস্তবতা হলো, এটা তাদের উপনিবেশবাদী প্রবণতার ফল। তারা মুসলিম বিশ্বের ও তৃতীয় বিশ্বের (তাদের ভাষায়) শক্তির উৎপাদককে ধ্বংস করে দিতে চায় এবং দূর থেকেই এই দেশগুলোকে অবরুদ্ধ ও দুর্বল করে রাখতে চায়। এটাই তাদের উপনিবেশবাদী স্বার্থ।

২. র‍্যান্ড কর্পোরেশনের আরেকটি দাবি হলো, অধিক জন্মদান নারী ও সন্তানের স্বাস্থ্যজনিত আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দেয়।

সন্তানের আধিক্য কখনোই পৃথকভাবে নারী ও সন্তানের জন্য স্বাস্থ্যজনিত ঝুঁকির কারণ নয়। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট কোনো মেয়ের জন্য এটা সমস্যাজনক হতে পারে বিভিন্ন কারণে। সাধারণভাবে উক্ত দাবিকে মূল বানানো যাবে না। যদি নির্দিষ্ট কোনো নারীর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই আশঙ্কা প্রকাশ করে, তবে বিষয়টা তার সাথেই বিশেষ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর ইসলামি শরিয়াহর নির্দেশনা হলো, যার বিশেষ সমস্যা আছে সে শিথিলতা গ্রহণ করবে। কিন্তু বিষয়টাকে সাধারণ মূলনীতি বানিয়ে জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

তারা যদি ন্যায়বান হতো, তাহলে বলত যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলোর ব্যবহারই নারীর শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, গর্ভধারণ কিংবা সন্তানদানের আধিক্য নয়। নিষ্ঠাবান বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বক্তব্য হলো, বন্ধ্যাকরণ নারীর স্বাস্থ্য ও শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর একটি বিষয়। এটি তাকে ক্যান্সারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত করতে পারে।

বিশেষ করে ইন্ট্রায়ট্রাই ডিভাইস জরায়ু-সংক্রান্ত অনেক সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয়। যেমন: পানি নিষ্কাশন, অধিক রক্তস্রাব, জরায়ু ছিদ্র হওয়া, পেট ব্যথা, জরায়ু ফুলে যাওয়া এবং তা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। জন্মনিরোধক ট্যাবলেটগুলোও নারীর জন্য ক্ষতিকর। প্রায়ই নারীর স্বাস্থ্যবিষয়ক ম্যাগাজিনগুলোতে নারীর শরীরের জন্য এই ট্যাবলেটগুলো কতটা ক্ষতিকর, তা নিয়ে গবেষণা প্রকাশিত হয়।

গর্ভধারণ নিয়ে এমন কিছু বিষয় আছে, যা পশ্চিমারা কখনোই অনুধাবন করতে পারবে না। এই রহস্য বুঝতে তারা অক্ষম। কারণ আখেরাত ও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশুদ্ধ ঈমান নেই। কিন্তু মুসলিম ফকিহরা ঈমানের দৌলতে আলোকিত। তাদের কাছে এই রহস্য দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। আর সেটা হলো, সন্তানের আধিক্য ও তাদের মৃত্যু স্বল্প সন্তানের চেয়েও বেশি কল্যাণকর। এর অর্থ এটা নয় যে, নারী ও শিশুর সুস্থতার ব্যাপারে অবহেলা করা হবে। কখনোই না। আল্লাহ তাআলা মৃত্যুকে মুসিবত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ.

'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কারও মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয় তখন ওসিয়ত করার সময় পারস্পরিক বিষয়াদি নিষ্পত্তি করার জন্য সাক্ষী বানানোর নিয়ম এই যে, তোমাদের মধ্য হতে

দুজন ন্যায়নিষ্ঠ লোক হবে (যারা ওসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষী থাকবে), অথবা তোমরা যদি জমিনে সফরে থাকো এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যুর মুসিবত এসে যায়, তবে অন্যদের (অর্থাৎ অমুসলিমদের) মধ্য থেকে দুজন হবে। অতঃপর তোমাদের কোনো সন্দেহ দেখা দিলে তোমরা সে দুজনকে নামাজের পর আটকাতে পারো। তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলবে, আমরা এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে চাই না, যদিও বিষয়টা আমাদের কোনো আত্মীয়ের হয়। এবং আল্লাহ আমাদের ওপর যে সাক্ষ্যের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন আমরা তা গোপন করব না। করলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব। (সূরা মায়েদা, আয়াত-১০৬)

কিন্তু যার শিশু মারা যায় সে এর বিনিময়ে প্রতিদান লাভ করবে। এবং এই শিশু কিয়ামতের দিন তার জন্য সম্পদ হিসেবে উপস্থিত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে কাদের সন্তানহীন মনে করো? তিনি বলেন, আমরা বললাম যার সন্তান জীবিত থাকে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না সে সন্তানহীন নয়; বরং সন্তানহীন তো সেই পুরুষ, যে তার কোনো সন্তানকে তার জন্য অগ্রে পাঠায় না।'

আরবদের ভাষায় সন্তানহীন হলো, যার কোনো সন্তান জীবিত থাকে না। আর হাদিসের মর্ম হলো, তোমরা মনে করছ সে ব্যক্তি সন্তানহীন, যে সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত। শরিয়াতের দৃষ্টিতে সে সন্তানহীন নয়; বরং যার কোনো সন্তান তার আগে মারা যায়নি, সে-ই প্রকৃত সন্তানহীন। কারণ সে তার সন্তানের মৃত্যুর শোক ও সবরের ফলে সওয়াব লাভ করত এবং এই সন্তান তার জন্য আখেরাতের অগ্রবর্তী সম্পদ হতো।

শাহাদাতের মর্যাদা ইসলামে অনেক বড় মর্যাদা। কোনো মহিলা যদি গর্ভধারণ কিংবা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়, ইসলাম তাকে শহিদী মর্যাদা দান করে। সে বিধানগতভাবে শহিদদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় যে নিহত হয়, সে শহিদ; মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহিদ; যে নারী গর্ভবতী হয়ে মারা যায় সেও শহিদ...।'

৩. র‍্যাড কর্পোরেশনের আরেকটি দাবি হলো, অধিক জন্মহার পৃথিবীর মৌলিক উপাদানে বিরূপ প্রভাব ফেলে। যেমন এটা পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানি কমিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দুনিয়ায় পাঠান, তখন তাকে কোনো ক্ষুধার রাজ্যে পাঠাননি, যেখানে খাবার ও পানীয় কিছু নেই; বরং এই জমিনকে তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর সন্তানদের জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত করেই পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَعَلْ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفْوَاجَهَا فِي أَرْبَعَةِ

أَيَّامٍ سَوَاءٍ لِّلسَّائِلِينَ.

‘তিনি তার উপরিভাগে দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে বরকত দিয়েছেন এবং তাতে (বসবাসকারী) সকল রিজিক-প্রত্যাশীদের জন্য সুসমভাবে রিজিক সৃষ্টি করেছেন (আর এ সবকিছু তিনি করেন) চার দিনে। (সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ১০)

আল্লাহর প্রস্তুতকৃত এই জমিন থেকে আদম আলাইহিস সালাম খাবার গ্রহণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সন্তানেরা খাবার আহরণ করে যাবে। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের নতুন নতুন বিভিন্ন কৌশল শিখিয়ে দেবেন, তাদের নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা দান করবেন এবং তাদের দুআ, ইস্তিগফার ও ইস্তিসকা এর মতো বিধান দেবেন।

জন্মনিয়ন্ত্রণের আয়োজকরা মনে করে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদকে ফুরিয়ে আনে, পরিবেশের অবক্ষয় ঘটায় এবং দেশের আয় কমিয়ে দেয়।

বাস্তবতা হলো, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনসংখ্যার চাপ মানুষকে নতুন প্রাকৃতিক সম্পদের তালাশ ও অনুসন্ধানের পথ দেখায়। যেন এর মাধ্যমে তারা বিদ্যমান সংকটকে মোকাবিলা করতে পারে। উপরন্তু নতুন কোনো প্রাকৃতিক উৎস উদ্ভাবনের ফলে মানুষ একদিকে নতুন উৎস থেকে সুবিধা গ্রহণ করে পুরোনো উৎস নিঃশেষ হওয়ার আশঙ্কা কমাতে পারে এবং অন্য দিক থেকে ব্যবহৃত উৎসের ওপর যেই চাপ, সেটাকেও হালকা করতে পারে।

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মেধায় ও হৃদয়ে তাদের জীবনাচার ও প্রাচুর্যের সাথে উপযোগী নিত্য নতুন পদ্ধতি ঢেলে দেন। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে, আল্লাহর ইচ্ছায় ততই তাদের আবিষ্কার, অনুসন্ধান, উদ্ভাবন বেড়ে যাবে। এটাই পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম। তবে মানুষ যদি অপরাধে লিপ্ত হয়, এর সুষ্ঠু ব্যবহার না করে; বরং ফাসাদ

ও জুলুমকে বিস্তার করে, তখন তারা নানামুখী সংকট ও আজাব থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না। এটাও পৃথিবীতে আল্লাহর সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়াহর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সন্তান-সন্ততির আধিক্য ইসলামে একটি প্রশংসনীয় ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়। ফলে ইসলাম ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন দেয় না। তবে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কারও যৌক্তিক সমস্যা থাকলে, সে সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন: সন্তান কিংবা মায়ের প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা, ফিতনা-ফাসাদের জমানার কারণে বাচ্চা অসৎ চরিত্রের হওয়ার আশঙ্কা থাকাসহ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার কারণে অস্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

তবে নিজেদের শরীরের সৌন্দর্য ঠিক রাখা, অধিক বাচ্চার কারণে লজ্জাবোধ করা, সন্তান গর্ভধারণ ও প্রতিপালনের কষ্ট থেকে বেঁচে থাকা, অভাব-অনটন বেড়ে যাওয়ার ধারণা রাখা, এই ধরনের কোনো কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

আর স্থায়ীভাবে প্রজননক্ষমতা নষ্ট করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। এক যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম যৌনচাহিদা পূরণের ব্যবস্থা না পেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চিরতরে যৌনশক্তি নষ্ট করে ফেলার অনুমতি চান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেন এবং তাদের এই আয়াত পাঠ করে শোনান,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

'হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন, তাকে হারাম সাব্যস্ত করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।' (সূরা মায়দা, আয়াত ৮৭)

তবে যদি জরায়ুতে এমন কোনো রোগ হয়, যা থেকে অপারেশন ব্যতীত পরিব্রাণ পাওয়া সম্ভব না, তাহলে জরায়ু কেটে ফেলা জায়েয আছে।

ওপরের বিধানগুলো একদম ব্যক্তি পর্যায়ে। সুনির্দিষ্টভাবে কেউ কেউ এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণকে একটি আন্তর্জাতিক পলিসি বানিয়ে, নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করে স্লোগান তৈরি করে ব্যাপকভাবে গর্ভধারণ ও সন্তান গ্রহণের প্রতি ভীতি ও অনাগ্রহ

তৈরি করার যেই কালচার, এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এটা পশ্চিমা বিশ্বের উপনিবেশবাদী রাজনীতির অংশ।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক যেই সম্ভাবনা তৈরি করে রেখেছেন এবং যুদ্ধ, মহামারির পাশাপাশি জন্ম-মৃত্যুর মতো যেই ন্যাচারাল রিপ্লেসমেন্ট সিস্টেম (প্রাকৃতিক প্রতিস্থাপন ব্যবস্থা) দিয়েছেন, এর ভেতর মানুষের স্বাভাবিক জন্মানক্ষমতা কখনো সমস্যাজনক হতে পারে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের অফিশিয়াল আয়োজক উপনিবেশবাদীরা জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করে, সেসবের সাথে প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার সম্পর্ক নেই বললেই চলে; বরং অধিকাংশ সমস্যাগুলোই তৈরি হয়েছে ভিন্ন কোনো কারণে। অপ্রাকৃতিক শিল্পব্যবস্থা, দেশের ম্যানেজমেন্ট-ব্যবস্থা, বিশেষভাবে বললে পুঁজিবাদীদের উপনিবেশবাদী ও জুলুমতান্ত্রিক রাজনীতিই স্বয়ং উক্ত সমস্যাগুলোর জন্য দায়ী।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যতগুলো যুক্তি দেখিয়েছে, তার সবগুলোই অবান্তর। এই দাবিগুলোর কোনো একাডেমিক ভিত্তি নেই। মুসলিম দেশগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো ছড়ানো এবং এগুলোর ব্যবহারকে কোনো প্রকার ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া ব্যাপক করার যেই প্রজেক্ট, এটা সম্পূর্ণ উপনিবেশবাদী একটি প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টে নারীর সুখ ও সুস্থতা, দেশের প্রকৃত উন্নতি ও সমৃদ্ধির সৎ চিন্তা থেকে উপনিবেশবাদী স্বার্থ বাস্তবায়নই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দাবিগুলো শত বছর আগে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ ও প্রাচ্যবাদের চিন্তারই পুনরাবৃত্তি। তবে তারা কেবল সেই চিন্তার বাস্তবায়ন, পদ্ধতি ও ভাষায় নতুনত্ব নিয়ে এসেছে মাত্র।

সুতরাং মুসলিম নারীদের দায়িত্ব হলো, শত্রুরা যেই চক্রান্তের বীজ আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে, সেটাকে ভালোভাবে অনুধাবন করা এবং তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যে পৌঁছান সহযোগী না হওয়া; বরং মুসলিম উম্মাহর শক্তিকে বৃদ্ধি করা এবং নিজের সন্তানদের সৎ, যোগ্য ও শক্তিশালী মুমিন হিসেবে গড়ে তোলা। ক্যারিয়ার, সৌন্দর্য ইত্যাদির নেশায় নারীদের মাঝে মাতৃত্বের প্রতি যে অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে, সেটাকে দূর করার জন্য আমাদের বোনদেরই এগিয়ে আসতে হবে। মাতৃত্বকে অনেকে বন্দিত্ব হিসেবেও প্রচার করেছে। মুসলিম বোনদেরই মাতৃত্বের স্বাদ ও তৃপ্তিকে নারীদের উপভোগ করাতে হবে। মাতৃত্বের পবিত্র ও পরম অনুভূতি মুসলিম তরুণীদের মাঝে জাগ্রত করতে হবে।

লিবারেলিজম কেন আপনার নিকাব পরিধানে বাধা দেয়?

'তাদের পর্দার আড়াল থেকে বের করে আনো, যেখানে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে।'

মুসলিমদেরকে যারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দমন করতে চায়, তারা অনেকদিন থেকেই মুসলিম নারীদের অবস্থাকে তাদের প্রধান হাতিয়ার বানিয়েছে, বিশেষত হিজাব। ঔপনিবেশিক সময়কালে মিশরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা তাদের উপনিবেশবাদ বৈধ করার জন্য মুসলিম নারীদের পর্দা এবং ইসলামে নারীদের অধিকারের কথা বলতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুশ প্রশাসন ইরাক যুদ্ধ শুরু করার মূল কারণ হিসেবে নারী মুক্তির কথা বলেছে। উপনিবেশবাদ-বিরোধী দার্শনিক এবং বিপ্লবী ফ্রাঞ্জ ফ্যাননের মতে, ঔপনিবেশিক আমলে আলজেরিয়ায় ফরাসি রাজনৈতিক নীতি ছিল- 'আলজেরিয়ায় সামাজিক কাঠামো ধ্বংস করতে এবং তাদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করতে হলে প্রথমেই নারীদের দিকে নজর দিতে হবে। নারীদের অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে বের করে আনতে হবে, যেখানে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে।

ঔপনিবেশিক সময় থেকে শুরু করে বর্তমান উদার পাশ্চাত্যেও একইভাবে বিভিন্ন সময় মুসলিম নারীর নিকাবকে নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে অন্যদের মধ্যে মুসলিমদের প্রতি ভয় এবং তাদের সাথে দূরত্ব তৈরি করা হয়েছে। গত বছর যুক্তরাজ্যে এমপি স্যারাহ ওলাস্টন (Sarah Wollaston) প্রকাশ্যে স্কুলগুলোতে নিকাব নিষিদ্ধের আহ্বান জানান। যার কারণে দেশব্যাপী নিকাবের বিষয়টি নতুনভাবে আলোচনায় আসে। সে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়নি কিন্তু সামাজিকভাবে নিকাব যে নিষিদ্ধ করা উচিত এমন ধারণার বীজ জনমানসে বুনে দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকে জাতীয় বিতর্কের নামে এবং সংবাদপত্রে 'সভ্য সমাজের কি নিকাবের বিষয়টি কঠোরভাবে নেওয়া উচিত না?' এমন শিরোনাম প্রকাশের মাধ্যমে সেই বীজের পরিচর্যা করে চলছে। বিভিন্ন কারণ ও অজুহাত দেখিয়ে এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা নিয়ে মানুষের মনে ধারণা আরও বদ্ধমূল করা হয়েছে। মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে- নিষিদ্ধ না করলেও অন্ততপক্ষে নিকাবকে দৃঢ়ভাবে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

নিকাব-বিরোধীরা নিকাবকে নারীর সুরক্ষা এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের পথে বাধা হিসেবে দেখে। নিপীড়িত হওয়া, কাজে বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং এমনকি নিকাবের উপস্থিতিতে আশেপাশের লোকজনের অস্বস্তিবোধ-সহ নিকাবের বিপক্ষে যুক্তি হিসাবে এমন হাজারো অজুহাত দেখায় তারা।

গত সপ্তাহে লন্ডনে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের জন্য বিখ্যাত এমন একটি স্কুলে একজন শিক্ষার্থীর নিকাবকে নিষিদ্ধ করা হয়। কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে ছাত্র-শিক্ষকের খোলামেলা আলোচনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন যেকোনো পোশাকের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নেবে। সেই সাথে অস্ট্রেলিয়াতেও 'নিরাপত্তার' উদ্দেশ্যে সংসদে নিকাব পরিহিতা নারীদের আলাদা করা হয়েছে। শর্তে বলা হয়েছে যে যদি কোনো মুসলিম নারী ক্যানবেরায় সংসদীয় কার্যক্রম দেখতে চায়, তবে তাকে আলাদাভাবে কাচের রুমে বসে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, নিকাব পরিহিতা নারীকে সব ধরনের চেক করা হলেও তাকে সেই কাচের রুমের মধ্যে অবস্থান করতে হবে। অথচ এসব কাচের রুমে বাচ্চারাও থাকে। মূলত স্কুলের বাচ্চাদের জন্য এ রুম নির্ধারিত। যদি এই নারীরা আসলেই নিরাপত্তা ঝুঁকি হয়ে থাকে, স্কুলের বাচ্চাদের সাথে একই রুমে কেন তাদেরকে রাখা হয়? আসলে এটি একান্তই নিকাব ও শারিআহর প্রতি ঘৃণা থেকে করা হয়।

To cover up, or to cover-up?

উদারপন্থী দেশগুলো পর্দার ওপর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার জন্য অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব পরিকল্পনাসমূহ তাদের নীতির সাথেই সাংঘর্ষিক। নিকাব পরিহিতা নারীদেরকে তারা বিভ্রান্তকারীদের শিকার কিংবা ভুক্তভোগী হিসেবে আলাদা শ্রেণিভুক্ত করে এবং তাদেরকে উদ্ধারের স্লোগান দেয়। এটা স্পষ্ট যে তাদের এমন দাবির মূলে অন্য কোনো গোপন উদ্দেশ্য আছে।

নিকাবের বিরুদ্ধে স্ব-বিরোধী যুক্তিগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি-

- 'নিকাবের মাধ্যমে পুরুষকে 'যৌন উত্তেজক' হিসেবে ছোট করা হয়, আবার পুরুষরাই নিকাব পরতে নারীদেরকে বাধ্য করে', তার মানে কি তাহলে পুরুষরা নিজেদের ছোট করার জন্য নারীদের ওপর নিকাব আরোপ করেছে?
- 'নিকাব নারীদের নিজ পরিচয়ে পরিচিত হতে না দিয়ে অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়', কিন্তু ওই একই লোকেরা আবার দাবি করে যে নিকাব পরিহিতা নারীদের দিকে সকলের নজর যাচ্ছে এবং নিকাব পরিহিতা নারীদের দেখে 'জনগণ ভীত'।

- 'নিকাব নারীদের ওপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়', এ কারণে কি যেসব নারী নিকাব পরতে চায় তাদেরকেও জোর করে নিকাব থেকে বের করে আনতে হবে?
- . 'নিকাব নারীদের ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা', কাজেই একজন নারী যদি নিকাব পরতে চায় তবে তার সে পছন্দকেও অস্বীকার করা উচিত?
- 'নিকাব নারীকে যৌন বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করে', তাই মুসলিম নারীদের আরও খোলামেলা পোশাক পরতে এবং তাদের নগ্নতাকে প্রকাশ করতে বাধ্য করা উচিত? সে ক্ষেত্রে নারী যৌন বস্তু হবে না?
- 'নিকাব একজন নারীকে অসামাজিক করে তোলে', কাজেই নিকাবকে হয় নিষিদ্ধ করতে হবে অথবা তাদেরকে বাড়িতে আবদ্ধ করতে হবে?
- 'নিকাব নারীর যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করে', বিশেষত যখন কোনো নিকাব পরিহিতা নারী আমাদের সাথে অন্য কোনো উপায়ে যোগাযোগ করতে চায়। মুখ খুলে না আসলে কথা বলতে না পারাটা কীসের ইঙ্গিত দেয়?
- 'নিকাব পরিহিতা একজন নারী নিপীড়িত এবং তাঁর কোনো মূল্য থাকে না', কিন্তু তারাই বলেন নিকাব পরিহিতা নারীরা নাকি 'বিপজ্জনক এবং প্রতারক'।
- 'নিকাবের ফলে নারীদের স্বাভাবিক যৌন চাহিদাকে বিপজ্জনক মনে হয়'। যারা নিপীড়িত তারাই আবার বিপজ্জনক?
- 'নিকাবকে নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে', পাশাপাশি তারা নিকাবকে পুরুষের যৌনতা নিয়ন্ত্রণের বিকল্প হিসেবেও দেখে।
- 'নিকাব পুরুষের জন্য চরম অবমাননাকর। কেননা নিকাব প্রমাণ করে যে পুরুষেরা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম নয়'- হ্যাঁ, একই কারণে একটি দরজার তালা যেকোনো অপরিচিত ব্যক্তির জন্য অবমাননাকর।

- 'নিকাব নারীর দেহ নিয়ে সামাজিক উদ্বেগের প্রতীক', কাজেই চলুন নারীদের দেহ নিয়ে জাতীয় বিতর্কের আয়োজন করি।

পাশ্চাত্যে লিবারেল গণতন্ত্রের অধীনে থাকা নারীদের নিকাব না পরার অধিকার যেমন আছে, ঠিক তেমনই কি নিকাব পরার অধিকার থাকা উচিত ছিল না? প্লাস্টিক সার্জারি, অজাচার (জার্মানিতে), সমকামী বিয়ের সমর্থন-সহ সকল প্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে এ লিবারেলিজম। যে কেউ সহজেই মনে করতে পারে এখানে বুঝি ব্যক্তির সকল প্রকার স্বাধীনতাকেই বৈধতা দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে লিবারেলিজম কখনোই নিকাবকে সমর্থন করবে না। লিবারেলিজম না কেবল, কোনো আদর্শই শতভাগ স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে না। তারা নিজেদের মতো করে স্বাধীনতার সংজ্ঞা বানিয়ে নেয় এবং মানুষকে স্বাধীন হতে 'বাধ্য' করে। এটি লিবারেলিজমের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং এটিই লিবারেলিজম।

লিবারেলিজমের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক জুডিথ শকলার (Judith N. Shklar) বলেন, 'লিবারেলিজম ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় যেকোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেবে। নির্দিষ্ট আদর্শের আওতায় প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সমান স্বাধীনতা থাকবে যে সে তার জীবনের সকল বিষয়ে নির্ভয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এতে কারও সমর্থনের প্রয়োজন নেই। এই বিশ্বাসই লিবারেলিজমের মৌলিক এবং একমাত্র সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা।

সমান স্বাধীনতার এ মূলনীতিই লিবারেলিজমের মধ্যকার ফাটলগুলো উন্মোচন করে দেয়। এই মূলনীতি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যেকোনো ধরনের স্বাধীনতায় সবার সমান অধিকার থাকে না; বরং কিছু নির্দিষ্ট স্বাধীনতায় প্রত্যেকের সমান অধিকার থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই সমানসংখ্যক নির্দিষ্ট কিছু স্বাধীনতা লাভ করবে। ধরুন আপনি ঠিক করে দিলেন, 'তুমি অমুক অমুক এবং অমুক জিনিসের মধ্যে কোনো একটি পছন্দ করো।' এটা কিন্তু স্বাধীনতা নয়। আপনি তার সীমা ঠিক করে দিয়েছেন। স্বাধীনতা যদি আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া থাকে তবে তা তো স্বাধীনতা নয়; বরং পূর্বনির্ধারিত কিছু অপশনমাত্র।

শকলারের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে রাজনৈতিক দার্শনিক জোসেফ রাজ বলেন, 'একজন ব্যক্তিকে তখনই স্বাধীন বলা যায় যখন তার কাছে পছন্দ করার মতো বিভিন্নরকম গ্রহণযোগ্য অপশন থাকে এবং সে যেকোনোটিকে বাছাই করে সে অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করতে

সক্ষম হয়। যে স্বাধীনতা ব্যক্তিকে ভালোর দিকে পরিচালিত করে না সে স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মূল্যহীন এবং খারাপ অপশনগুলোকে স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত করা এবং তা রক্ষা করার কোনো মানেই হয় না। মানুষের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যিক সেসব পদক্ষেপ গ্রহণে মানুষকে বাধ্য করা এমনকি বলপ্রয়োগ করাও বৈধ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সভ্য করে তুলতে যেকোনো প্রকার পদক্ষেপ নেওয়া বৈধ। এতে করে যদি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিলুপ্তও হয়ে যায় কিংবা তাদের ওপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া আরোপের কারণে তাদের সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে যায় তবুও।

এসব নীতি থেকে বোঝা যায় যে লিবারেল আদর্শের এক রহস্যময় বিচারক আছে যে ঠিক করে দেয় কোনটা 'ভালো', 'খারাপ', 'মূল্যহীন' এবং কখন কোনো ব্যক্তির বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' হস্তক্ষেপ করা 'আবশ্যিক'। এই সূত্রানুসারে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত, যে ঠিক করবে মানুষ কখন কতটুকু স্বাধীনতা পাবে।

এসব বৈষম্য লিবারেলিজমের সাথে মোটেই সাংঘর্ষিক না; বরং তা এই নীতি বিবর্জিত আদর্শের অস্তিত্ব রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এমন একটি আদর্শ কখনোই মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পালনের অধিকার দেয় না। বরং তারা নিজেদের মতো ভালো খারাপের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয় এবং একজন ব্যক্তির স্বাধীনতার 'গ্রহণযোগ্য অপশনগুলো' কী হবে তা ঠিক করে দেয়। কাজেই লিবারেল সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর নিকাব পরার স্বাধীনতা অস্বীকার করাটাই

স্বাভাবিক। নিকাবের বিরুদ্ধাচরণ তাদের মূল্যবোধের সাংঘর্ষিক না। তাদের দৃষ্টিতে নিকাবকে নিষিদ্ধ করা অবৈধ কিছু না; বরং লিবারেলিজমের নীতিই হলো ভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজের মতো 'সভ্য' করতে বলপ্রয়োগ করা।

অটোম্যান খিলাফাহর মতো অতীতের ইসলামিক সমাজব্যবস্থা বুঝতে পেরেছিল যে বিভিন্ন সংস্কৃতির এবং ধর্মের একাধিক সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে তাদেরকে তাদের নিজস্ব রীতিনীতি চর্চার সুযোগ দিতে হবে। তাই অটোম্যান খিলাফাহর বহুসাংস্কৃতিক সমাজব্যবস্থায় খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদেরও অন্য সকলের মতো নিজস্ব সংস্কৃতি উদ্যাপন করতে দেখা গিয়েছিল। তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা করত এবং তাদের ছিল নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস এবং ভাষা। এমনকি তাদের ছিল নিজস্ব আদালত, যেখানে তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্ন হতো। পুরোপুরি ভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী সম্প্রতির সাথে একত্রে বসবাস করত। কখনোই সংখ্যালঘুদের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর

কোনো ধরনের আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিংবা তাদেরকে কখনো মুসলিমদের অনুকরণে কিছু করতে বাধ্য করা হয়নি।

জোরপূর্বক আন্তীকরণের (forced assimilation) ধারণাটি হলো লিবারেলিজমের অধীনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি। সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর বদলে লিবারেলিজম সব আদর্শকে বল প্রয়োগ করে বা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে শেষ করে দেয়। এজন্যই লিবারেল সমাজব্যবস্থায় বহুজাতিক সমাজ গড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। আর শেষমেশ আমরা দেখতে পাই লিবারেল গণতন্ত্রের অধীনে খ্রিষ্টান বা ইহুদি ধর্মের সেকুলার সংস্করণ; যা মূলত লিবারেলিজমেরই আরেক রূপ।

ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়, ঈমান; প্রভু নই, মুমিন

ইসলামের একটি দৃঢ় বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শিক ভিত্তি এবং মানবজীবনের সুসংহত সামগ্রিক পরিকল্পনা থাকার কারণে তার মোকাবিলা করা লিবারেলদের জন্য বরাবরই অনেক কঠিন। ইসলামের আদর্শের সাথে লিবারেল আদর্শের মৌলিক পার্থক্য হলো স্বাধীনতার বিষয়টি।

যখন আমিনা টাইলার (Amina Tyler) উলঙ্গ হয়ে দাবি করেছিল-'আমার শরীর আমার, তা অন্য কারও সম্মানের উৎস না' (নিঃসন্দেহে তার শরীর সেসময় কারোরই সম্মানের উৎস ছিল না) তখন নারীবাদীরা তাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। সে তখন তার নিজের সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে লিবারেল নারীবাদের অন্যতম মূলনীতি তুলে ধরছিল-'নিজের শরীরের ওপর নিজের মালিকানা'।

এভাবেই নারীবাদীদের নারী স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন শক্তিশালী হয়।

লিবারেল নারীবাদীরা দীর্ঘদিন ধরেই এক অযৌক্তিক অভিযোগ করে আসছে যে, নারীদেরকে কেবল শারীরিক সত্তা হিসেবে দেখা হয়, তাদের শরীরের ভেতর যে একটা বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা রয়েছে তাকে নাকচ করা হয়। তারা এই ধারণাকে 'আবদ্ধকরণ' (enmeshment) বা 'মূর্তকরণ' (embodiment) বলে থাকে। নারীবাদীদের মতে, 'নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি জৈবিক, বেশি দৈহিক, এবং বেশি প্রাকৃতিক'।[১০] তারা তর্ক জুড়ে দেয়, 'আমি কেবল আমার দেহই নই, আমি আমার শরীরের মালিক'।

পুরুষ কিংবা নারী-কেউই আমরা নিজেদের শরীরের মালিকানা দাবি করতে পারি না। মালিকানা বলতে যদি নিয়ন্ত্রণ করা বোঝায় তাহলে মূলত আমাদের কারোরই নিজ শরীরের মালিকানা নেই। আমরা কি নিজেদের নিজেদের জন্ম দিয়েছি? নিজেদের তৈরি করেছি? কিংবা নিজেদের আকার-আকৃতি নির্ধারণ করেছি? মালিকানা বলতে যদি রক্ষণাবেক্ষণ বোঝায় তবে আমরা কি শিশু এবং বৃদ্ধ বয়সে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম? নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং মানসিক সুস্থতার জন্য কি আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ এবং সমাজের ওপর নির্ভরশীল নই? আমাদেরকে ভাষা কে শিখেয়েছে? আমাদের চিন্তাশক্তি কে দিয়েছে? শত শত বছরের আহরিত জ্ঞান কি আমরা নিজে নিজেই একবারে আবিষ্কার করে ফেলেছি? ইসলাম স্বীকার করে যে আসলে এ দেহের মালিক আমরা নই। আর এ কারণেই আমরা আমাদের দেহের সাথে যা ইচ্ছা করতে পারি না। এ শরীর আমাদের নিকট আমানতস্বরূপ

এবং আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণ করা। যেসব মুসলিম নারী নিকাব পরেন তারা ইচ্ছা হয়েছে বলে বা স্বামী জোর করেছেন বলে পরেন না (যেমনটা লিবারেলদের ধারণা); বরং তারা নিকাব পরেন ঈমান এবং দায়িত্ববোধ থেকে।

নারীবাদীরা নারীদের 'আবদ্ধকরণ' নিয়ে অভিযোগ করে বলে, নারীদের এ অবস্থা ছিল ঔপনিবেশিক সময়ের নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠীতে। বিষয়টা হাস্যকর ঠেকে যখন তারা মুসলিম নারীদেরকে পর্দায় আবৃত একটি বিবেকহীন দেহ হিসেবে বিবেচনা করে। নিকাব পরিহিতা মুসলিম নারীদেরও যে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা করা ক্ষমতা আছে এবং সে নিজেও চিন্তাশক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে নিজের স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করবে কি-না ও পর্দা অবলম্বন করবে কি-না, বিষয়টি তারা নিজেরাও ভাবে না। নারীবাদের ব্যাখ্যায় আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মন্তব্য করেন, 'নারীবাদীদের ধারণা পশ্চিমা ব্যতীত অন্য সবাই নিজস্ব সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পশ্চিমারাই কেবল যৌক্তিকভাবে চিন্তা করে'।

একজন মুসলিম নারীর জনজীবনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হলো নিজেকে আবৃত করা। আরবিতে পর্দার (নিকাব) ব্যুৎপত্তিগত শব্দ হলো 'ন-ক-ব' যার অর্থ ভেদ করা, খনন করা, অন্বেষণ করা এবং ভ্রমণ করা। নিকাব পরিহিতা নারীরা সম্পূর্ণ সুরক্ষার সাথে সমাজে চলাফেরা করতে পারে, সামাজিক কার্যক্রমে নিজের উপস্থিতি তুলে ধরতে পারে, লোকজনের গবেষণার বস্তুতে পরিণত না হয়েই বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আর নিকাবই তাদের এসব অধিকার নিশ্চিত করে।

নারীবাদীদের মতে নারীর লজ্জাশীলতা কিংবা পোশাকের ব্যাপারে একজন নারীর ন্যূনতম যে সামাজিক মূল্যবোধ, তা নারীকে পরাধীন করে। এসব প্রমাণ করে একজন নারীর দেহ মূলত তার নিজের নয়। তারা মনে করে এসব পোশাক যে কেবল নারীর পরিচয় কেড়ে নেয় তা-ই নয়; বরং তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করে যেখানে পুরুষ বলে দেবে নারীর কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। অথচ এসব লিবারেল নারীবাদীরাই কর্তা হয়ে উঠতে চায়, একে নিজের জন্মগত অধিকার ভাবে!

পাশ্চাত্যে লিবারেল গণতন্ত্রের অধীনে থাকা নারীদের নিকাব না পরার অধিকার যেমন আছে ঠিক তেমনই কি নিকাব পরার অধিকার থাকা উচিত ছিল না? আমরা দেখেছি যে লিবারেল স্বাধীনতার ধারণাকে নিকাবের অধিকারের পক্ষে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার বোকামি ছাড়া কিছু না। লিবারেলিজম আসলে মানুষকে সকল প্রকার স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলে না। তারা

তাদের স্বার্থ দেখেই নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়। এই 'স্বাধীনতা' অন্য সকলের ওপর চাপিয়ে দেয়। এই নীতি লিবারেল আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং এটিই লিবারেলিজম। লিবারেলিজম নিজের আদর্শ, স্বার্থ রক্ষার্থে ভিন্ন মতাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার হরণ করে। এই ক্ষয়িষ্ণু লিবারেল গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে আমাদের উচিত ইসলামের ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া, ইসলামি সমাজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা। অনেক সংস্কৃতি, অনেক আদর্শের এ পৃথিবীতে কেবল ইসলামই নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কবি নজরুল বলে গেছেন-বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

হ্যাঁ। কবি সত্য বলেছেন। নারীর অবদান ধরিত্রীতে পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

কিন্তু সর্বযুগেই নারীরা ছিল অধিকার বঞ্চিত। নানাভিদ্ বঞ্চনার শিকার। এখনো নারী অধিকারের নামে নারীকে জাহেলী যুগের সেই পণ্য করার প্রতিযোগিতাই পরিলক্ষিত হয়।

ইসলাম পূর্ব সময়ে নারীদের মানুষ হিসেবে কোন মর্যাদা ছিল না। তাদের কেবলি অন্যান্য ব্যবহার উপযোগী পণ্য মনে করা হতো। নারী জন্মকে পাপ মনে করা হতো। লজ্জজনক মনে করা হতো। নারীদের পণ্যের মত বাজারে বিক্রি করা হতো। নারীদের কোন মীরাছী হক ছিল না। কোন মেয়েকে কোন পুরুষ হত্যা করলে, তার বদলে হত্যাকারী তার ঘরের একজন মেয়েকে প্রেরণ করতো। যাতে করে হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হয়।

কন্যা সন্তান জন্ম নিয়ে সমাজের লজ্জায় পিতারা তার কন্যাকে জীবন্ত দাফন করে দিতো। হয়েজ নেফাসের সময় নারীদের আলাদা ঘরে রেখে দেয়া হতো। নারীদের তালাকের কোন অধিকার ছিল না। ছিল না বিবাহিত নারীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কোন অধিকার। স্বামী মৃত্যুর পর স্বামীর সাথেই

দাহ করার মত ঘৃণ্য প্রথাও ছিল প্রচলিত।

ইসলাম এসে নারীকে তার সর্বোচ্চ আসনে আসীন করেছে। সংক্ষেপে আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে তা উল্লেখ করা হল।

১.জন্ম নেবার অধিকার

নারী জন্মকেই পাপ মনে করা হতো। অকল্যাণকর মনে করা হতো। ইসলাম এসে সেই জাহিলী ধারণাকে পায়ে দলে ঘোষণা করে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়াকে সুসংবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ [১৬:৫৮]

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

[১৬:৫৯]

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তারা মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে।

তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট। [সূরা নাহল-৫৮-৫৯]

কন্যা সন্তানকে হত্যা করাকে ভয়াবহ জঘন্য গোনাহ বলে আখ্যায়িত করে ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ [৮১:৮] بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ [৮১:৯]

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? [সূরা তাকয়ির-৮-৯]

২.প্রতিপালনের অধিকার

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার ঘরে কন্যা সন্তান হয়, তারপর তাকে ভালোভাবে প্রতিপালন করে, তাহলে এ কন্যা তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার দেয়াল হয়ে যাবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬২৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ»

হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান প্রতিপালন করে। এমনকি তারা প্রাপ্ত বয়স্কা হয়ে যায়। তাহলে উক্ত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমাদের দুই আঙ্গুল যতটুকু কাছাকাছি সে আমার ততটুকু কাছে থাকবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৩১]

৩. পুরুষের উপর রয়েছে নারীর অধিকার

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ [২:২২৮]

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। [সূরা বাকারা-২২৮]

إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ، حَقًّا

তোমাদের নারীদের উপর অধিকার রয়েছে। তেমনি নারীদেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৮৫১, তিরমিজী, হাদীস নং-১১৬৩]

৪. বিয়ের পূর্ণ অধিকার নারীর

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُنْكَحُ الْبَكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»

কোন বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫১৩৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, মেয়ে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে অভিভাবকের চেয়ে অধিক হকদার।

হযরত বুরাইদা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবীজী সাঃ এর কাছে এসে বলল, আমার পিতা আমাকে তার ভতিজার কাছে বিয়ে দিয়েছে, যাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাবী বলেন, তখন রাসূল সাঃ বিষয়টি মেয়ের ইখতিয়ারের উপর ন্যস্ত করেন, [অর্থাৎ ইচ্ছে করলে বিয়ে রাখতেও পারবে, ইচ্ছে করলে ভেঙ্গেও দিতে পারবে] তখন মহিলাটি বললেন, আমার পিতা যা করেছেন, তা আমি মেনে নিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েরা যেন জেনে নেয় যে, বিয়ের ব্যাপারে পিতাদের [চূড়ান্ত] মতের অধিকার নেই {সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৮৭৪, মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুয়াহ, হাদীস নং-১৩৫৯, সুনানে দারা কুতনী, হাদীস নং-৩৫৫৫}

৫.নারীর উপার্জন তার নিজের

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبْنَ [৪:৩২] ০

পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। [সূরা নিসা-৩২]

৬.মোহর পাবার অধিকার

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [৪:৬] ০

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। [সূরা নিসা-৪]

৭.উত্তম ব্যবহার পাবার অধিকার

وَاعِشْرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [৪:১৯]

নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন। [সূরা নিসা-১৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ

حَلَقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, মুমিনদের মধ্যে পূর্ণতর মুমিন সেই ব্যক্তি, যার আচার আচরণ উত্তম। আর তোমাদের মাঝে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীদের কাছে উত্তম। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৪১৭৬)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَالْأَطْفَهُمْ بِأَهْلِهِ

হযরত আয়শা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, মুমিনদের মাঝে সেই ব্যক্তি অধিকতর পূর্ণ মুমিন, যে ব্যক্তি সদাচারী এবং নিজ পরিবারের জন্য কোমল এবং অনুগ্রহশীল। {মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৪২০৪, তিরমিজী, হাদীস নং-২৬১২}

৮. মীরাহ পাবার অধিকার

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [৪:৭]

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত। [সূরা নিসা-৭]

৯. নারী পুরুষ সমান মর্যাদার

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا

[২:১২৬]

যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণ ও নষ্ট হবে না। [সূরা নিসা-১২৪]

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ [২০:৬০]

যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে, পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে। [সূরা গাফির-৪০]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ [১৬:৯৭]

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। [সূরা নাহল-৯৭]

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় নারীরা মানুষের অধিকার হিসেবে পুরুষের সমমানের।

হাদিস নং:২৩৬]

১০. স্বামী ঠিকমত খরচ দিতে না পারলে তালাক চাইতে পারবে স্ত্রী

تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي،

স্ত্রী বলবে, হয়তো আমার খরচ দাও, নতুবা আমাকে তালাক দাও। [বুখারী, হাদীস নং-৫৩৫৫]

১১. খরচ কম দিলে না জানিয়ে খরচ নিয়েও যেতে পারবে!

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ هُنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخْذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মা হিন্দা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলেন, আবু সুফিয়ান (রাঃ) একজন কৃপণ ব্যক্তি। এমতাবস্থায় আমি যদি তার মাল হতে গোপনে কিছু গ্রহণ করি, তাতে কি আমার গুনাহ হবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যায্যভাবে গ্রহণ করতে পার। [বুখারী, হাদীস নং-২২১১]

১২. মা হিসেবে অধিকার

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

[১৭:২৩]

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [১৭:২৪]

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার

জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা।

তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।
[সূরা ইসরা-২৩, ২৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: " ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল যে, পিতা মাতার মাঝে কে সবচে' বেশি উত্তম ব্যবহারের উপযুক্ত? নবীজী বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, তারপর কেন? নবীজী বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? নবীজী বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? নবীজী বললেন, তোমার বাবা।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৪৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَفْذَامِ الْأُمَّهَاتِ

হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাত হল, মায়ের পায়ের নিচে।

[মুসনাদুশ শিহাব, হাদীস নং-১১৯]

১৩. পুরুষের দায়িত্ব বেশি নারীর হক বেশি

হক। যাকে বাংলায় বলি অধিকার। অধিকারের ফলাফল হল ভোগ। আর দায়িত্ব এর ফলাফল হল ত্যাগ। যে হক বেশি পায়, সে ভোগ করার সুযোগ বেশি পায়। আর যার দায়িত্ব বেশি তার ত্যাগের পরিমাণ বেশি হতে হয়।

আল্লাহ পুরুষদের দায়িত্ব বেশি দিয়েছেন।

আর নারীদের হক বেশি দিয়েছেন।

এ কারণে জন্ম থেকে বিয়ে পর্যন্ত নারীর যাবতীয় খরচ বাবার দায়িত্বে। আর বিয়ের যাবতীয় খরচ স্বামীর দায়িত্বে।

অন্য শব্দে বললে জন্ম নেবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরুষের দায়িত্ব হল, নারীর দেখাশোনা করা। তার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে এনে তার প্রতিপালন করা। তার খিদমাত করা।

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
[৪:৩৪]

পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। [সূরা নিসা-৩৪]

أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ۚ

আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা (যথাসম্ভব) তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আহারের সুব্যবস্থা করবে। [সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং-৩০৮৭]

১৪.রাষ্ট্রপতির মর্যাদা

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ - [৩৩:৩৩]

তোমরা গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।
[সূরা আহযাব-৩৩]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [৩৩:৫৭]

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। [সূরা আহযাব-৫৯]

যেমন একজন রাষ্ট্রপতির নিজেই কামাই করতে হয় না। উপার্জন করতে রাস্তায় বের হতে হয় না। তার সব কিছুই তার খাদিম খুদ্দামরা করে দেয়। তিনি থাকেন সুদৃঢ় প্রাচীর ঢাকা কক্ষে।

যখন কোন প্রয়োজনে বের হন, তখনো সেই প্রটোকল, সেই নিরাপত্তার চাদরে ঢেকেই বের হন।

তেমনি নারী হল মর্যাদাবান। ঘরের রাষ্ট্রপতি। তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা দায়িত্ব পুরুষের। যখন কোন প্রয়োজনে বের হয়, তখনো তার নিরাপত্তায় পুরুষ সঙ্গী বডিগার্ড হিসেবে থাকা জরুরী। যেন কোন লম্পট তার দিকে অসম্মানী দৃষ্টিতে তাকাতে না পারে। নারী তার প্রটোকল হিসেবে সম্মানের পর্দা দিয়ে পূর্ণ শরীর ঢেকে রাস্তায় বের হবেন।

এটা তার জন্য অপমান নয় সম্মানের। ইজ্জতহানী নয়, বরং সর্বোচ্চ ইজ্জত প্রদান।

যারা নারীদের সম্মানের নামে রাস্তায় বের করতে চায়, তারা মূলত নিজেদের লাম্পট্যতার খাহেশ পূর্ণ করার জন্য এমনটি করে থাকে।

এ কারণে ধর্ষণের শীর্ষে এক নাম্বারে আমেরিকা। ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ডের মত উলঙ্গপনার রাষ্ট্রগুলো ধর্ষণ শীর্ষ তালিকায় দশ দেশের মাঝে থাকে।

যা প্রমাণ করে, নারীদের রাস্তায় নামিয়ে, পণ্য বানিয়ে আমেরিকান রা যেমন ৯১% নারীদের ধর্ষণের শিকার বানিয়েছে। তেমনি পুরো বিশ্বের নারীদের নারীবাদের স্লোগান দিয়ে এমন লজ্জাজনক অবস্থায় ফেলতে চায়।

ইসলাম এ নোংরামী ও লজ্জা থেকে নারীকে রক্ষা করতে পর্দার বিধান দিয়েছে।

আজ পুরো বিশ্বজুড়ে নারীরা নিপেড়িত। নির্যাতিত। নিষ্পেষিত। ধর্ষণের শিকার। নেই নারীদের প্রকৃত মর্যাদা। ইজ্জত ও সম্মান। দুই টাকার ম্যাচ বাক্সে, রাস্তার বিলবোর্ডে, পত্রিকার পাতায় পাতায় নারীকে অর্ধ উলঙ্গ করে আবাল বৃদ্ধ বণিতার নোংরা দৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে সেই জাহেলী যুগের পন্থায়।

নারীবাদ আর নারী মুক্তির নামে নারীকে পণ্য বানানোর মহড়া চলছে সর্বত্র। কেবলি একটি ভোগ্য পণ্য, যৌন খেলনা হিসেবে পেশ করা হচ্ছে পর্নগ্রাফী এবং নাটক সিনেমার পর্দায়।

নব্য নারী জাতির এহেন লজ্জাজনক জাহিলিয়াতকে রুখতে হলে, নারীমুক্তির একমাত্র অবলম্বন হল মানবতার নবী, রাহমাতুল্লিল আলামীনের আদর্শ ও নারী অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

নারীবাদীদের চোখে নারীরা

আধুনিকতার কিছু ন্যারেটিভ আছে। এই রকম একটা ন্যারেটিভ হলো-প্রফেশন আর ব্যক্তিত্বকে মিলিয়ে ফেলা যাবে না।

নারীবাদীরাও যেহেতু মনেপ্রাণে আধুনিকায়নে বিশ্বাসী, তাই তাদের মুখে এই কথা বেশি শোনা যায়। বিশেষ করে নারীদের ব্যাপারে তারা এই তত্ত্ব খাটানোর জোরদার চেষ্টা চালায়। যেমন: কোনো নারী কর্মজীবনে পতিতা বলেই তাকে অসম্মান করা যাবে না। কেননা অন্যান্য সকল পেশার মতোই পতিতাবৃত্তি তার পেশা মাত্র। একজন নারীকে তারা পেশার মধ্যে আটকে ফেলে। তার কাছে মোরাল, বা অন্যান্য মানবীয় দিকগুলো অর্থহীন হয়ে যায়।

একজন নারী যতই মমতাময়ী হোক না কেন, স্বামী-সংসারের জন্য নিজের জানটাও দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকুক, কিন্তু সে যদি কোনো অর্থ উপার্জন না করে, নারীবাদীদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। একজন নারী যদি তার বিশ্বাসে, আদর্শে, গুণে ও চরিত্রে অতুলনীয় হয়, সমাজে তার মতো আর একটা মেয়েও খুঁজে পাওয়া না যায়, তবুও সে যদি "ঘরে-বসে-থাকাদের" একজন হয়, তবে নারীবাদীদের চোখে সে ব্যর্থ।

কোনো সাধারণ নারী যদি হয় এমন যে সে প্রচণ্ড কর্মঠ, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, অসম্ভব পরোপকারী, কিন্তু কাজের বিনিময়ে টাকার পাহাড় জমায় না বরং একজন গৃহিণী; তবুও তার চাইতে বরং নারীবাদীরা সেই নারীকে বেশি সফল ভাবে যে নিজে জানেও না কেন চাকরি করে, কিন্তু সমাজের বেধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন নয়টা-পাঁচটা অফিস করে মাসের শেষে কিছু টাকা কামায়।

নারীবাদিতায় ক্যারিয়ারটাই ফ্যাক্টর, টাকাটাই ফ্যাক্টর, এজন্যই দেখবেন, নারীবাদীদের রোলমডেল যারা হয়, তারা ব্যক্তিজীবনে মোরালি ফলো করার মতন কোনো ক্যারেঙ্কার না। আর আমাদের কাছে, মানে মুসলিমদের কাছে মোরাল ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইখানেই নারীবাদিতার সাথে আমাদের একটা মৌলিক বিরোধ রচনা হয়ে যায়।

আমরা যদি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার দিকে তাকাই, দেখতে পাব, তিনি বিয়ের পর আজীবন স্বামীর খেদমত করে গেছেন। বিয়ের আগে থেকে তাঁর ব্যবসা ছিল, কিন্তু বিয়ের পর, ব্যবসা-বাণিজ্য চুলোয় যায়, ওসব নিয়ে ভেবে দেখেন নি। নিজের সমস্ত টাকা ঢেলে

দিয়েছেন নবুওয়তের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য। হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন ধ্যানমগ্ন থাকতেন, তখন স্বামীর জন্য খাবার তৈরি করে সেই বিশাল পর্বতে বেয়ে বেয়ে উঠেছেন কেবলমাত্র স্বামীর কাজে সহায়তা করার জন্য।

আমাদের কাছে খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বিশাল মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর চোখেও খাদিজা (রা) বিশাল মর্যাদার অধিকারী। এজন্যই তিনি দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যান। দুনিয়াতে যেই চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ নারী আছেন, তাদের মধ্যে খাদিজাও একজন।

একজন নারীবাদীর চোখ দিয়ে চিন্তা করুন, এই কাজটি কি আপনি করতে রাজি হতেন? প্রথমেই কি আপনি বলতেন না, আমার স্বামী কাজ করবে, আমি কেন করব না? আমার স্বামী দশ ঘণ্টা ধ্যানে বসে থাকবে, আর আমি যাব তার খাওয়া বানাইতে? নো ওয়ে!! সিরিয়াসলি স্পিকিং, কোনো নারীবাদী নারীকে খাওয়া নিয়ে পাহাড় কেন, পাঁচ তলার উপর যেতে বলতেও তার স্বামী ভয় পেতো।

এই রকমই একটা ত্রুটিপূর্ণ, বিকারগ্রস্তের মতো দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় নারীবাদ। তারা সবকিছুকেই "টাকা"র সাথে লিংক করে। কাজের মূল্যায়ন করে টাকার অংক দিয়ে, আর মানুষের মূল্যায়ন করে তার পেশাগত সাফল্য ও টাকার পরিমাণ দিয়ে। অথচ কর্মজীবন মানুষের জীবনের একটা দিক মাত্র, কখনোই এটা তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে না।

যে লোকটা চুরি করাকে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, তার অটেল টাকা থাকতে পারে, কিন্তু সে কি কখনও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মতো? যে লোকটার কোটি টাকার বিজনেস আছে, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে বউ-পেটায়, কিংবা পেডোফাইল, সেই লোকটার ব্যাপারে আপনার কী মত? তাকে কি আপনি এত সহজে একজন "রোলমডেল" হিসেবে আপনার ছেলেমেয়ের কাছে উপস্থাপন করবেন?

আমি নিশ্চিত, তখন কিন্তু নারীবাদীরা বলবে না যে, এই লোকের পেশা এবং ব্যক্তিজীবনকে আলাদা করে দেখা হোক।

তাহলে যে মেয়েরা অন্য কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে, যে নারীরা পেশার নামে, ক্যারিয়ারে উন্নতির আশায় দশজনের সাথে রাত কাটাতে মাইন্ড করে না, যে নারীরা টাকা কামাতে নিজের শরীরকে ব্যবহার করে, তাদেরকে কীভাবে

আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যায়? ব্যক্তিগত জীবনকে বাদ দিয়ে একজন মানুষকে "রোলমডেল" হিসেবে গ্রহণ করা কি আদৌ সম্ভব, নাকি সেটা যৌক্তিক?

খালি কর্মজীবনের সফলতার মাপকাঠিতে মানুষকে বিচার করাকে আমরা সমস্যা মনে করি। আমরা মানুষকে বিচার করতে চাই তার বিশ্বাস, চরিত্র, কাজকর্ম ও আদর্শের সমন্বয়ে। রাসূলুল্লাহ (স) কে আমরা রোলমডেল মনে করি, কেননা তিনি শুধু কর্মজীবনে না, ব্যক্তিজীবনে, সংসার জীবনে, পারিবারিক জীবনেও অনন্য সাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইসলামে মোরালিটি একটা কী ফ্যাক্টর। ইসলাম মানুষের মোরালিটিকে উন্নত করতে শেখায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর কাছে মানুষকে বিচার করা হবে তার তাকওয়ার ভিত্তিতে। সে কতটা আল্লাহকে ভয় করেছে, ইসলাম মেনে চলেছে সেই অনুযায়ী। কারো গায়ের রং, বংশ ইত্যাদি দ্বারা নয়। কিন্তু নারীবাদিতা মানুষকে বিচার করেছে তার সৌন্দর্য দিয়ে, বা টাকার পরিমাণ দিয়ে! বিচারের মাপকাঠি দেখেই বোঝা যায় এই আইডলজির গ্র্যাভিটি কত লো, কত সস্তা।

পেশা জীবনকে ব্যক্তিজীবন থেকে আলাদা করে ফেলার ব্যাপারটা গা থেকে কাপড় খুলে নেওয়ার মতো। মানুষের তখন আর পেশা নিয়ে কোনো হায়াবোধ থাকে না। লিবারেলিজম বা ফেমিনিজমের এইসব ন্যারেটিভের একটাই উদ্দেশ্য। আবজাব তত্ত্ব কপচায়ে লজ্জাশরমকে ধ্বংস করে দেওয়া। কর্মজীবনকে ব্যক্তিজীবনের থেকে আলাদা করে ফেলে নারীদেরকে রাস্তায় নামায় আনবে, বিছানায় টেনে নিয়ে যাবে, যে যতটা পারে আর কি। এরপরে হাতে একটা ললিপপ ধরায় দিয়ে বলবে, তুমি বেশ্যা হলেই তো আর অপবিত্র নও। পেশাকে নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে মিলিয়ে ফেলো না...

গৃহিণী মেয়েদের "আটকে পড়া মেধা" ও নারীবাদীদের আক্ষালন

কয়েকবছর আগের কথা। তখনও ইসলাম প্র্যাক্টিস শুরু করিনি। ফেসবুকে এক প্র্যাক্টিসিং আপুর প্রোফাইলে দেখি লেখা-A Proud Homemaker. একটু খটকা লাগল। হোমমেকার, মানে গৃহিণীর কাজে আবার প্রাউড ফিল করার কী আছে? এটা কি কোনো যোগ্যতার ব্যাপার?

আলহামদুলিল্লাহ্ দ্বীনকে একটু একটু করে বুঝতে শেখার পর তার সেই প্রাইডের তাৎপর্যটা অনুধাবন করতে পেরেছি। সেই সাথে দেখেছি, দ্বীন মেনে চলা মানুষদেরও অনেকেই আছেন যারা ফেমিনিজমের বলয় থেকে বেরোতে পারেন নি। তারা এখনো মেয়েদের ঘরে থাকাকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে পারছেন না। আমার এই লেখাটা মূলত তাদের জন্যই।

১. একটা কথা প্রায়ই কানে আসে। পড়ালেখা করে মেয়েরা কেন গৃহিণী হবে? কেন তাদের যোগ্যতা, মেধার সাক্ষর তারা রাখতে পারবে না? কেন তাদের স্বামীর ঘরে পচে মরতে হবে?

বেগম রোকেয়া থেকে শুরু করে আজকের নারীবাদীরা, সবার মুখের ভাষার মূল একটাই, মেয়েরা বাইরে কাজ করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে। একটা মেয়ে যদি ম্যাথ-ফিজিক্স খুব ভালো পারে, তবে তার উচিত সেই মেধাকে ব্যবহার করা, ঘরকন্না নিয়ে পড়ে না থাকা। আমাদের সমাজে মেয়েদের একটা বড় অংশ ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং-অনার্স পড়ছে, অনেক উচ্চতর ডিগ্রি নিচ্ছে। তারা ছেলেদের সাথে পাল্লা দিচ্ছে, ক্লাসে ফাস্ট-সেকেন্ড হচ্ছে, জব করছে-এসবের মাধ্যমে তারা নাকি নিজেদের মেধার ব্যবহার করছে।

দ্বীন বুঝতে শেখার আগে কথাগুলো আমার কাছে লজিক্যাল মনে হত। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারে, সেকুলাররা আমাদের যা বোঝাতে চায় বাস্তবতা তা নয়। আচ্ছা, আমাদের দেশের গড়পড়তা একটা কর্মজীবী মেয়ে আসলে কী করে? একটা চাকরিই তো! সেখানে সে 'মেধার প্রয়োগ' আসলে কতটুকু করে? অফিসে আটঘণ্টা কাজ, বসের ঝাড়ি, তার মনমত চলা-এর মধ্যে আসলে মেধার প্রয়োগ কোথায় হয়? এমন তো না এই মেয়েরা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে, গবেষক হচ্ছে। বাংলাদেশের কথা বাদ দিলাম। সারা বিশ্বেরই সায়েন্টিস্টদের মধ্যে কতজন নারী? ইতিহাসের শীর্ষ গণিতজ্ঞ, পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদদের মধ্যে একজন নারী খুঁজে পেতে কেন মাইক্রোস্কোপ লাগে?

কাজেই ম্যাথ-ফিজিক্সে বিরাট প্রতিভাধর নারীরা গৃহপরিচারিকার হাতে সম্ভানকে সঁপে দিয়ে যেখানে সীমিত বেতনে নটা-পাঁচটা জব করে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরে, সেখানে তাদের মেধার খুব বেশি অংশ খরচ করতে হয় বলে অন্তত আমার মনে হয় না। এ ত গেল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের মেয়েরা যারা অন্তত সায়েন্স ফিল্ডেই কাজ করেন তাদের কথা। আমাদের সমাজের বেশিরভাগ কর্মজীবী নারীই অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের বেসিসে চাকরি করেন না। ব্যাক্সে ঢুকলেই যে এত এত নারী দেখা যায়, তাদের কয়জন ইকোনমিকস ব্যাকগ্রাউন্ডের? আর যারা আছেনও, তাদের কয়জন নিজেদের অ্যাকাডেমিক শিক্ষাকে জব ফিল্ডে কাজে লাগান? এছাড়া বাংলা বা দর্শন থেকে পাশ করা মেয়েরা যে সুদী ব্যাক্সে রিসিষ্ট সই করছেন, তাতে মেধার কোন প্রয়োগটা হয়?

সেকুলারদের কথা শুনলে মনে হবে নারীরা মেধাবী বলেই তাদের চাকরিতে নেওয়া হয়। অথচ মেয়েদের সবচে বেশি দেখা যায় কর্পোরেট জবগুলোর রিসেপশনে, ফ্রন্ট ডেস্কে, টেলিভিশনের সংবাদ পাঠিকা হিসেবে। এসবে বিবেচ্য কোন 'মেধা' নয়, রূপ-কণ্ঠ এবং কে বসের নির্দেশ অনুসারে পোশাক পরতে পারেন তার ওপর। এসব প্রতিষ্ঠানের ভেতরের খবর আমার ভালোই জানা আছে। বিজ্ঞাপনে অপ্রাসঙ্গিকভাবে সুড়সুড়ি দিতে স্বল্পবসনা নারী কোন মেধার বলে চান্স পায়? মোবাইলের অপারেটরে রেকর্ডকৃত নারীর কণ্ঠ কোন মেধার পরিচায়ক? সীমাহীন সংগ্রাম করে ধৈর্য আর বিচক্ষণতার সাথে যে নারীটি তাঁর সংসারকে আগলে রাখেন, তারচেয়ে এই কর্মজীবী মেয়েরা বেশি মেধার প্রয়োগ করে? ব্যাপারগুলো আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

২. মেধা মানে কী? মেধা হল আল্লাহ প্রদত্ত কতগুলো গুণের কমবাইন্ড রূপ। বোঝার Capability, ধারণক্ষমতা, স্কিল, মেমোরি ইত্যাদি অনেকগুলো ব্যাপারকে আমরা একত্রে 'মেধা' বলি। এর কোনোটি আল্লাহ কাউকে কম দেন, আবার কোনোটি বেশি দেন, সেগুলোকে ব্যবহারের মাধ্যমে বাড়িয়ে নিতে হয়। এই মেধা হল একটা আমানত, যেটা আল্লাহ দিয়েছেন এবং আল্লাহর কাছে এই আমানতের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ হয়তো কাউকে খুব ভালো মেমোরি দিয়েছেন, সেটা সে কোনকাজে ব্যয় করেছে, এর জবাবদিহিতা আল্লাহর কাছে দিতে হবে। সেদিন পড়লাম বিদেশী একজন বোনের কথা যিনি মাত্র আড়াই মাসে কুরআন হিফয করেছেন। সুবহানআল্লাহ!

আমার যেখানে কয়েকটা আয়াত মুখস্থ করতেই অনেক সময় লেগে যায় সেখানে তিনি আশি দিনেরও কম সময়ে পুরো ত্রিশ পারা হিফয করেছেন। এটা কি মেধার প্রয়োগ নয়? তিনি

কি বুয়েট-মেডিকেলে পড়া মেয়েদের চেয়ে কোনো অংশে কম মেধাবী? কিন্তু তিনি তাঁর এই মেধাকে ব্যবহার করলেন এমন একটা কাজে, যা দিয়ে দুনিয়া-আখিরাতে সীমাহীন কল্যাণ হাসিল করা যাবে।

আজকে আইনস্টাইনের থিওরি সলভ করে একটা উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে নটা-পাঁচটা জব করা ইঞ্জিনিয়ার মেয়েদের 'মেধার প্রয়োগ' দেখে আমরা হাততালি দিই, অথচ এই বোনটার মূল্য দিতে পারি না। শুধু কি চক্ষুহীনেরাই অন্ধ? আমি পড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং। ইসলাম নিয়ে একটু একটু করে পড়তে শুরু করার পর থেকে বুঝতে পারি, ইসলামের পড়াশোনাটা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে মোটেই সহজ না, বরং অনেকক্ষেত্রেই বেশি কঠিন। এই পড়ার জন্য মেধা, ধৈর্য, অধ্যবসায়ের অনেক বেশি দরকার আছে।

ইমাম বুখারী-ইমাম তিরমিযী-ইমাম গাজ্জালীদের ফটোগ্রাফিক মেমরি নিয়ে কত কাহিনী প্রচলিত। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম বলেছিলেন, ইসলামের ফিকহ নিয়ে পড়া উচিত সবথেকে মেধাবী ছাত্রদের। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই জায়গাটায় মেধা খাটানোর কথা আমরা ভাবতে পারি না। আমাদের মেয়েরা এত এত মেধাবী বলে আমরা গলা ফাটাই, অথচ ইসলামের বেসিক বিষয়গুলোতে তাদের অজ্ঞতা ছেলেদের চেয়েও বেশি। ইসলাম বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন এমন পুরুষ হয়তো অনেকেই আছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কয়জন কুরআন-সুন্নাহর মিনিমাম প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু রাখেন? নাহ, জানেন না। কারণ মেয়েরা তাদের মেধার প্রয়োগ ইসলামের ক্ষেত্রে না করে এমন কিছু ক্ষেত্রে করেন, যা আখিরাতে তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও তাদের বিশেষ কাজে আসে না। এই মেধার কতটুকু মূল্যায়ন করা সম্ভব? শুধু কি সেকুলার অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি দিয়েই মেয়েরা খুব উচ্চশিক্ষিত হচ্ছে বলে সিদ্ধান্তে আসা যায়?

৩. এবার একটু তুলনামূলক আলোচনা করি। আমাদের সমাজের একজন গড়পড়তা তরুণী মেয়ের দিনের একটা বড় অংশ কাটে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ছবি তুলতে, সে ছবি আপলোড দেওয়া এবং ছবি তোলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে করতে। দিনের বাকি অংশ কাটে গালগল্প করতে করতে, কে কী পরল, কার কতটুকু ম্যাচিং হয়নি সে হিসেব করতে করতে। এছাড়া ভারতীয়-ইংরেজি সিরিয়াল আর মুভি এসব তো আছেই। আর বয়ফ্রেন্ড থাকলে তো কথাই নেই। দেশের শীর্ষস্থানীয় ভার্টিগেলার শীর্ষ মেয়েরা, যাদের আমরা খুব 'মেধাবী' বলে জানি, তাদেরও বেশিরভাগ সময় এভাবেই কাটে। এসব কোন 'মেধা'র পরিচায়ক, আমার জানা নেই। বিয়ের পরেও এই রুটিনে খুব বেশি পরিবর্তন আসে না। হ্যাঁ, জব করতে গিয়ে হয়তো বিনোদনের সময়টা একটু কম পান। তবে ভারতীয় সিরিয়াল আর পাশের বাড়ির ভাবীর

সাথে অমুক ভাবীর আলোচনা করে ভালোই টাইম পাসিং হয়। দুজন নারী কথা বলবে আর তৃতীয় কাউকে নিয়ে আলাপ হবে না এ যেন ভাবাই যায় না, তাই না!

আর সংসারের সমস্যাগুলোকে হতাশা বাড়ানোর উপকরণ হিসেবে দেখা হবে, কেন অমুক ভাবী এত দামী শাড়ি পরেন আর আমি এত কমদামী শাড়ি পরি, এই আক্ষেপে জীবনের অর্ধেক আনন্দ মাটি হবে। অন্যদিকে একজন বিবাহিতা প্র্যাক্টিসিং মুসলিমাহ গৃহিণী নারীর কথা ধরুন। তিনি ইসলাম স্টাডি করেন যথাসাধ্য, ইসলামের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করেন, তার প্রয়োগ করেন, স্বামী-সংসারের দেখভালে নিয়মিত কুরআন-সুন্নাহর হেল্প নেন, সংসারের সমস্যাগুলো ইসলামের জ্ঞান দিয়ে সমাধান করেন, স্বামীকে প্রেরণা দেন, পরামর্শ দেন, সংসার সামলাতে প্রচুর ধৈর্য আর বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। প্রেরণা গ্রহণ করেন ইসলামের ইতিহাসের আলোকিত নারীদের কাছ থেকে। পাশের বাড়ির ভাবীর সাথে আলোচনার বিষয় হয় শাইখ উসাইমিনের অমুক বইটা পড়েছেন কি না, আর কুরআন কার কতটুকু মুখস্থ হল তার আপডেট। এখন বলুন তো, এই দুই শ্রেণীর নারীর মধ্যে কে বেশি মেধাবী? কে বেশি 'মেধার প্রয়োগ' রাখেন?

বাঁদরের ভঙ্গিতে সেলফি তোলা মেয়েটির হয়তো হায়ার ডিগ্রি আছে, জব করে। আর 'ঘরে আটকে থাকা' মেয়েটির এত ডিগ্রিও নেই, জবও করে না। অথচ তাদের দৈনন্দিন কাজগুলো আমাদের বলে দেয়, কে মস্তিষ্ক ব্যবহার করে আর কে করে না। হ্যাঁ, এটাকেই আমরা মেধার প্রয়োগ বলি। আমাদের এটাকেই আমরা মেধার প্রয়োগে বলি। আমাদের হোমমেকার নারীরা তোমাদের কর্পোরেট মেয়েদের চেয়ে শতগুণ বেশি মেধাবী আলহামদুলিল্লাহ্।

৪. শিক্ষাব্যবস্থার সেকুলারকরণের সাথে সাথে মেয়েদেরকে পুরুষের 'সমান' বানাবার এক অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করার একটা ধরণ হল এই, ছেলেদের এবং মেয়েদের একই সাবজেঞ্চে একই মেথডে একই জায়গায় একইসাথে পড়াশোনা করতে হবে, এরপর জব ফিল্ডে তাদের একইভাবে নেওয়া হবে। অথচ বিয়ের ক্ষেত্রে সবসময় চাওয়া হবে ছেলের পজিশন যেন মেয়ের ওপরে থাকে। বাংলাদেশে আজ লাখ টাকা বেতনের চাকরি করা মেয়ে কয়জন? কিন্তু দেখা যায় স্বল্প বেতনের মেয়েটিও লাখ টাকার ছেলে খোঁজে বিয়ের জন্য। মেয়েটি কোন উপার্জন না করলেও উচ্চ পদের ছেলের সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু ছেলেটির উপার্জন না থাকলে তার বিয়ে হবে না বছরের পর বছর চলে গেলেও। আসলে মানুষকে একটা পর্যায়ে গিয়ে ফিতরাহের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। বিয়ের পর ছেলেটিই মেয়েটির দায়িত্ব নেবে, তাকেই সংসার চালাতে হবে; এসব মানুষ পাল্টাতে পারে

না, কারণ তবে সমাজের ভিত্তিই নড়ে উঠবে। অথচ এই পর্যায়টির কথা ভেবে আগের স্টেজগুলো গড়ে ওঠানো হয় না, সবখানে জোর করে নারী-পুরুষকে 'সমান' বানানোর চেষ্টা, শেষে গিয়ে খাপ না খাওয়াতে পেরে ব্যালেন্স নষ্ট করা। আল্লাহ্ নারী-পুরুষকে আলাদা করে বানিয়েছেন, সমাজে আলাদা ভূমিকা দিয়েছেন। এই পৃথক ভূমিকার জন্য প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়েকে গড়ে তোলাটাই যৌক্তিক ছিল।

কিন্তু 'ছেলেদের যা পড়তে হবে মেয়েদেরও ঠিক তাই তাই পড়তে হবে'-এমন একটা জবরদস্তিমূলক মানসিকতা নারীদের সেই 'নারীত্ব' কে বিনষ্ট করে দিতে চায়, ফলাফল সংসারজীবনে গিয়ে ভাঙ্গনের উপক্রম। এক সেকুলারপন্থী আপুর একটা লেখায় পড়েছিলাম এক মেয়ে বিয়ের পর অফিস থেকে রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে দেখে তার স্বামী না খেয়ে বসে আছে, কারণ স্বামী রান্না করতে জানে না আর মেয়েটিও রান্না করে যায় নি। এটা নিয়ে মনোমালিন্য দেখা যায়। লেখিকা আপু পুরো দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন স্বামীর ওপরে, সে কেন রান্না করতে পারবে না? অথচ মেয়েটি কেন স্বামীকে একলা ঘরে রেখে রাত এগারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকবে, এই প্রশ্নটা তাদের ওঠে না, কারণ তারা বিশ্বাস করে একটা মেয়ে যত বেশি বাড়ির বাইরে থাকবে তত সে 'মেধাবী', স্বামী-সন্তানের 'বন্দীশালা' থেকে মুক্ত হয়ে সে তত স্বাধীন!

অথচ এই মেয়েরা যে মস্তিষ্কের ওপর একটা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে আছে সেটা তারা বোঝে না, সেকুলাররা তাদের যেভাবে ভাবতে চায় তারা ঠিক সেভাবেই ভাবে। এটাই মানসিক দাসত্ব, যা শারীরিক দাসত্বের চেয়ে অনেক বেশি বিপদজনক। 'মেধার প্রয়োগ' ঘটানোর কথা বলে তারা আমাদের মেয়েদের দাস বানাতে চায়, আর আমরা মৌলবাদীরা তাদের চাহিদার মুখে পদাঘাত করি। এইজন্য আমাদের প্রতি তাদের এত রাগ।

৫. একটা মেয়েকে বিয়ের পর অনেকগুলো কঠিন ধাপ অতিক্রম করতে হয়। নতুন পরিবেশে নতুন মানুষদের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া, দ্রুত ম্যাচিউর হবার তাড়না; আর যদি চারপাশের লোকেরা হেল্পফুল না হয় তবে তো কথাই নেই। এরপর সন্তান ধারণ, প্রতিপালন, কনডাক্ট এসব তো আছেই। এসবগুলো কাজ সাফল্যের সাথে করতে গেলে নিজের মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটানোর কোন বিকল্প নেই। সীমাহীন, ধৈর্য, অধ্যবসায়, বিচক্ষণতা, ত্যাগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ আর অন্যান্য মানবিক গুণাবলির সমাহার প্রয়োজন। মায়েদের মর্যাদার কথা কেন এতবার আসে সেটা আমি নিজের মায়ের কথা ভাবলে বুঝি। তিনিও গৃহিণী। তাঁকে দেখে বুঝেছি আদতে সংসার সামলানোর এই কাজটা কত কঠিন।

আশ্চর্য এই যে, নারীবাদীদের চোখে সংসার করা নাকি মেধার অপব্যয়! গৃহিণী নারীরা নাকি কাজ না করে ঘরে বসে থাকেন!! এই মেন্টালিটির রেজাল্টটা আমরা খুব সহজেই পেতে বসেছি। আজকে ঘরে ঘরে একেকটা ফ্র্যাঙ্কস্টাইন গড়ে উঠছে। যারা নিজের বাপকে কুপিয়ে মারে, মাকে গুলি করে। বিপথগামী ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে বাবা-মা রা কপাল চাপড়ায়- কেন সময় থাকতে প্যারেন্টিং কে গুরুত্ব দেই নি। প্যারেন্টিং কাজটা খুবই কঠিন। একটা সন্তানকে আল্লাহর অনুগত বান্দারূপে গড়ে তোলা বড় শক্ত কাজ। ক্ষণিকের একটা ভুল সিদ্ধান্তের মাসুল দিতে হয় আজীবন। অথচ আমাদের বলা হচ্ছে, এই কাজটিতে নাকি মেধার প্রয়োগ নেই!! মেধার প্রয়োগ কেবল ভারী ভারী বই গলধঃকরণে!! জাফর ইকবাল ম্যাথ অলিম্পিয়াডে মেয়েদের অংশগ্রহণকে মেধার মাপকাঠি মাপে। আমরা তা মানি না। একজন মেধাবী নারী মানে একজন সফল স্ত্রী। একজন মেধাবী নারী মানে একজন সফল মা। আর আজকের সেকুলার শিক্ষায় ফাস্ট-সেকেন্ড হওয়া 'মেধাবী' মেয়েরা স্ত্রী-মায়ের ভূমিকায় একের পর এক ব্যর্থ হলেও তাদের গুণগানে মুখরিত নারীবাদী সমাজ! কারণ তাদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল যে বড্ড সহজ!

গৃহিণী মুসলিম নারীদের প্রতি সেকুলারদের খুব রাগ। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে জব ফিল্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড প্রস্তুত-সম্ভবপর সবকিছুই তারা করল মেয়েদের হাতের পুতুল বানাতে। অথচ এরপরও কিছু পর্বতহৃদয় নারী তাদের দেখানো চাকচিক্যের তোয়াক্কা না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় স্বামী-সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন।

এই মেয়েরা তৈরি করেন একেকজন সিংহপুরুষ। নুসাইবাদের ঘরেই হাবীব বিন জায়েদদের জন্ম হয়। পার্থিব অর্জনের সীমাহীন মোহের জাল বিছিয়ে এই মুত্তাকী নারীদের কিনতে পারে না বলেই 'ঘরে আটকে থাকা', 'মেধার অপচয়'সহ হাজাররকম কুৎসা আর নিন্দার ঝড়। এর মূলে তাদের গায়ের জ্বালা। ক্ষোভ। হিংসে। হ্যাঁ, আমাদের মেয়েরা 'ঘরে আটকে থেকে'ই পৃথিবী জয় করবে ইনশা আল্লাহ্। আমাদের মায়েদের গড়ে তোলা সিংহরাই জমিনের বুকে আবার কালিমার পতাকা উত্তোলন করবে বিইযনিল্লাহ।

ডিয়ার সেকুলার নারীবাদীরা,

"তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরতে থাকো"

[সূরা আল ইমরান:১১৯]

এবং সবশেষে, মুসলিম নারীদের জন্য আবার সেই স্মরণিকা-

"যখন নারী তার পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে, তার (রমযান) মাসের সাওম পালন করবে, তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করবে, তখন তাকে বলা হবে: তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা কর, সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।"

[১৬৬১- মুসনাদে আহমাদ]

পার্থক্য

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। নবীজীর প্রিয় আনসারি সাহাবি। সাহাবিদের মধ্যে যাদেরকে ধরা হতো জাঁদরেল আলিম; হযরত জাবির তাদের অন্যতম। নবীজীর ওফাত পরবর্তী সময়ে ছিলেন 'মুফতিল মাদিনা' বা মদিনার মুফতি। বিভিন্ন মাসয়ালার প্রয়োজনে সাহাবিরা চলে আসতেন তাঁর কাছে। হাদিস তলব ছিল তাঁর অতি আকাজক্ষিত বিষয়। এক হাদিসের তলবে সফর করেছেন মাসাধিককাল। হাফেজ যাহাবির বিবরণ অনুযায়ী, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশি।

জাবিরের পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম রাযিয়াল্লাহু আনহু। বদরের যুদ্ধে নবীজি যে-কজন উপ-দলনেতা নির্ধারণ করেছিলেন, তিনি তাদের একজন। উহুদের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর শাহাদাত বরণ করেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর দায়িত্বে রেখে যান নয়জন মেয়েসন্তান। হযরত জাবির নিজ মুখে সেই বিবরণ দিচ্ছেন।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি ষোলোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তখনও যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়ে উঠিনি। এ সময় উহুদ যুদ্ধে আমার পিতা শহিদ হন। আমার নয় বোনের দায়িত্ব রেখে যান আমার কাঁধে। সর্বপ্রথম আমি অংশগ্রহণ করি হামরাউল আসাদ যুদ্ধে।"

এই নয় বোনকে দেখভাল করার জন্য জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন বিধবা নারী বিয়ে করেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে বোনদের লালনপালন করেন।

হযরত জাবির কি বিশেষভাবে বোনকে দেখভালের উদ্দেশ্যে লক্ষ রেখেই বিয়ে করেছিলেন?
শোনা যাক ইমাম বুখারির রেওয়াযাতে, সাহাবির নিজ বয়ানে।

“এক যুদ্ধে নবীজীর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলাম। (যুদ্ধ শেষে মদিনায় ফিরছি।) আমার ক্লান্ত
উট মন্তর গতিতে পথ চলছে। নবীজি এসে পৌঁছলেন।

-'কে? জাবির?' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন।

-'জি।' আমি জবাব দিলাম।

-'কী ব্যাপার, পিছিয়ে আছ কেন তুমি?' নবীজি প্রশ্ন করলেন।

-'পথ চলতে চলতে উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গতিও মন্তর হয়ে গেছে। তাই পিছিয়ে পড়েছি।'
আমি জবাব দিলাম।

এরপর নবীজি হাতের লাঠি দিয়ে আমার উটকে খুঁচিয়ে বললেন, এবার আরোহণ করো।
নির্দেশ মতো আমি উটে চড়লাম। আমার উটকে নবীজির উট থেকে একটু দূরে-দূরে রেখে
চলছি।

পথ চলতে চলতে নবীজি প্রশ্ন করেন,

-'জাবির, বিয়ে করেছ?'

-'জি, ইয়া রাসূলুল্লাহ।' সংক্ষেপে উত্তর দিই।

-'কুমারী না পূর্ব-বিবাহিতা?' নবীজি জানতে চান।

-'পূর্ব-বিবাহিতা।' জবাব দিই।

-'কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তুমি তার সাথে আনন্দ-কৌতুক করতে, সেও তোমার সাথে
চিত্ত বিনোদন করত।' নবীজির কণ্ঠে কিছুটা আশ্চর্যের স্বর।

-‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ছোট ছোট বোন আছে। তাই এমন একজন নারীকে বিয়ে করতে চেয়েছি, যে তাদেরকে একত্র করে রাখবে। মাথার চুল আঁচড়ে দিবে। তাদের দেখাশোনা করবে।’ আমি জবাব দিলাম।

এরপর নবীজি বলেন, ‘তুমি তো এখন বাড়ি যাচ্ছ। বাড়িতে পৌঁছে স্ত্রীর সাথে মুজামাআ করবে।’

একই হাদিসের ভিন্ন বর্ণনায় জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর বক্তব্য বিবৃত হয়েছে এভাবে-‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পিতা যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। আমার ছোট ছোট বোন আছে। তাদের কাছাকাছি বয়সের মেয়ে বিয়ে করব, এটা আমার পছন্দ হয়নি। যে তাদের আদব-আখলাক শেখাতে পারবে না, তাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন বিধবা নারী বিয়ে করেছি। যেন সে তাদের দেখাশোনা ও আদব-আখলাক শেখানোর দায়িত্ব পালন করতে পারে।’

কুতুবে সিভাহ সহ প্রায় সকল হাদিসের কিতাবে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কোনো বর্ণনাতেই এর প্রেক্ষিতে নবীজির কোনো বিরূপ মন্তব্য বা নসিহত পাওয়া যায়নি। বলাবাহুল্য, সাহাবিদের কোনো আমলের ক্ষেত্রে নবীজির নীরবতা শরিয়তে ‘তাকরির’ বা অনুমোদন বলে বিবেচিত হয়। এই কাজটি করেছেন মদিনার মুফতি সাহাবি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। এবং নীরব থেকে তা অনুমোদন করেছেন ফতোয়ার কেন্দ্রবিন্দু খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা। আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু মারা যাওয়ার পূর্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, দ্বিতীয় আর বিয়ে করবেন না। কিন্তু আবু সালামা তাকে সেই প্রতিজ্ঞা পালনে নিষেধ করে যান। সাথে দোয়া করে দেন, ‘হে আল্লাহ, আমার পরে উম্মে সালামাকে আরও উত্তম একজন স্বামী মিলিয়ে দিও। যে তাকে দুঃখ-কষ্ট দিবে না।’ উম্মে সালামা ভেবে পাচ্ছিলেন না, আবু সালামার চেয়ে উত্তম স্বামী কে হতে পারে? ইদত শেষ হবার পর হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন। অবশেষে নবীজি প্রস্তাব দেন।

নবীজি যখন প্রস্তাব দেন, তখন উম্মে সালামার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

তাঁর প্রথম কথাই ছিল- 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইনি গায়রা ওয়া মুসবিয়াহ; ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার গাইরত অনেক বেশি। আমার অনেকগুলো ছোট ছোট সন্তান আছে।'

দেখা যাচ্ছে, নবীজির প্রস্তাব যেখানে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার, তখনও উম্মে সালামার প্রধান চিন্তা ছিল-কীভাবে তিনি তাঁর সন্তানদের লালনপালন করবেন। পরবর্তীতে নবীজির ঘরে তারা লালিতপালিত হয়েছে। সন্তান লালনপালনের প্রতি উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা এতটাই মাতৃত্বসুলভ ছিলেন; তাঁর ঘরোয়া কাজে সহযোগী নারীর সন্তানকেও নিজের দুধ পান করিয়েছেন। বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরি রহ. সেই সৌভাগ্যবান সন্তান।

উম্মুল মুমিনীন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা। নবীজির প্রিয়তম সন্তানদের জননী। নবুওয়তের আগে ও পরে তাঁর ঘরনি। উম্মুল মুমিনীন খাদিজা ছিলেন নবীজির চার মেয়ে ও এক ছেলের জননী। তিনি শুধু সন্তান জন্ম দেননি; বরং জননী ও ঘরনি হিসেবে সকল কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। নবীজিকে ঘরোয়া সকল চিন্তা থেকে মুক্ত রেখেছেন। ঘরোয়া সকল কাজ শেষ করে হেরা গুহায় নবীজির জন্য খাবার বহন করে নিয়ে গেছেন।

উপরোক্ত সবগুলো ঘটনাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে নেওয়া। প্রথমটি তাঁর এক প্রিয় সাহাবির; দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী-উম্মাহাতুল মুমিনিনের।

এবার দেখা যাক, নবীজি স্ত্রী হিসেবে কোন নারীদের প্রশংসা করেছেন?

আবু আব্দুর রহমান আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "তোমরা কুমারী নারী বিয়ে করো। কারণ তারা হয় মিষ্টভাষী, অধিক সন্তানধারিনী এবং অল্পেতুষ্ট।"

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উটে আরোহণকারীদের মধ্যে কুরাইশ নারীরা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। তারা সন্তানের প্রতি অধিক মমতাময়ী ও স্বামীর সম্পদের প্রতি অত্যধিক যত্নশীল হয়ে থাকে।

অর্থাৎ, স্ত্রী হিসেবে দুই ধরনের নারীকে নবীজি প্রশংসা করেছেন। এক. কুমারী নারী; দুই. সন্তান ও স্বামীর প্রতি মমতাময়ী ও দায়িত্বশীল নারী। প্রথমটি দৈহিক এবং দ্বিতীয়টি সাংসারিক

দায়িত্ব। তাহলে দেখা যাচ্ছে-নিছক দৈহিক হক আদায়ই কেবল একজন স্ত্রীর দায়িত্ব নয়; বরং সন্তান পালন এবং স্বামীর সংসারের দেখাশোনা করাও স্ত্রীর দায়িত্ব।

এই দায়িত্বই পালন করেছেন উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা। স্বামীর বড় সংসারের হাল ধরেছেন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিজ্ঞ স্ত্রী। এটাই ফিতরাত; এটাই স্বাভাবিকতা।

এখন প্রশ্ন হলো-এই যে উম্মাহাতুল মুমিনিন সংসারের এত দায়িত্ব পালন করেছেন, এর কতটুকু ফরজ? কতটুকু সুন্নাত?

এই প্রশ্নের আগে প্রথমেই মাথায় রাখা জরুরি-জীবন নিছক ফরজ-ওয়াজিব দিয়ে চলে না; এরচেয়েও বেশি প্রয়োজন নফল ও মুস্তাহাবের। খোদ কেয়ামতের দিনও অধিকাংশ মানুষ ফরজ-ওয়াজিব দিয়ে পার পাবে না; প্রয়োজন হবে অসংখ্য নফল ও মুস্তাহাবের। সংসার জীবনে ফরজ-ওয়াজিবের চেয়ে নফল-মুস্তাহাব ও নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রয়োগই সবচেয়ে বেশি। নিছক ফরজ-ওয়াজিবের ওপর ভর করে বসে থাকলে শতকরা ৯০ ভাগ পরিবারই টিকবে না। ভেঙে পড়বে সম্পূর্ণ পরিবারব্যবস্থা।

তাহলে ফরজ-ওয়াজিবের প্রসঙ্গ কেন শরিয়তে রাখা হয়েছে? কেন সন্তানকে দুধ পান করানো ফরজ করা হয়নি? লালনপালনও কেন ফরজ নয়?

এই প্রসঙ্গের আয়াত-হাদিস ও ফিকহি মাসয়ালাগুলো গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, শরিয়ত এই প্রসঙ্গগুলোর অবতারণা করেছে মানুষকে জুলুম থেকে রক্ষা করতে। এগুলো সাধারণ অবস্থায় স্বাভাবিক জীবনে প্রয়োগের জন্য নয়। এর জন্য রয়েছে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস, নবীজি ও সাহাবিদের জীবনী। এই প্রসঙ্গগুলো প্রয়োগ হবে তখনই, যখন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর জুলুম হবে। তাকে প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করা হবে। এই পরিস্থিতিতে স্ত্রীও স্বামীর এসব 'না-ফরজ' হক আদায় থেকে বিরত থাকতে পারবে।

শরিয়ত স্ত্রীর জন্য সন্তানকে দুধ পান করানো ফরজ করেনি বটে; তবে দুধ পান করানোর জন্য অসংখ্য ফযিলত ও পরকালীন নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মাতৃত্বের দায়-দায়িত্ব আদায় করার পরই কেবল একজন মা হাদিসে বর্ণিত তিনগুণ ফযিলতের হাদিসে তৃপ্তি পেতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সৃষ্টিই করেছেন এভাবে-পুরুষ বাইরের কাজ আঞ্জাম দিবে। নারী আঞ্জাম দিবে ঘরোয়া কাজ। বৈবাহিক বৈতরণী পাড়ি দিয়ে এ দুজনের সমন্বিত উদ্যোগে যা পরিচালিত হবে-এর নাম পরিবার। ইসলামে বৈবাহিক ব্যবস্থা নিছক দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার মাধ্যম নয়; বরং হালাল উপায়ে দৈহিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি আদর্শ পরিবার গঠনের মাধ্যম। যে-পরিবারে স্বামী আদায় করবে বাইরের দায়িত্ব, স্ত্রী আদায় করবে ঘরোয়া দায়িত্ব।

এক্ষেত্রে স্ত্রীর এতসব দায়-দায়িত্ব ও কষ্টে স্বামীর যেমন সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত; তেমনি স্ত্রীরও স্বামীর পাহাড়সম দায়িত্ব বাইরের কষ্টের ব্যাপারে সহমর্মী হওয়া উচিত। স্বামীর যেমন উচিত নয় "বাসায় কী এমন কাজ করো" বলে খোঁচা দেওয়া, স্ত্রীরও উচিত নয় "বাইরে থেকে এসে নবাবের মতো আদেশ করো" বলে তিক্ততা তৈরি না করা। কারণ, স্বামী বাইরে থেকে এলে তাকে হাসিমুখে স্বাগত জানানো স্ত্রীর অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব।

এই স্বাভাবিকতা ও সংসারে স্ত্রীর যেমন ইহসান আছে স্বামীর প্রতি; তেমনি স্ত্রীর প্রতিও আছে স্বামীর অব্যবহিত ইহসান। স্ত্রী যেমন স্বামীকে ঘরোয়া সকল চিন্তা ও পেরেশানি থেকে মুক্ত রাখে, স্বামীও স্ত্রীকে বাইরের সকল প্রয়োজন ও বিপদে আগলে রাখে। সংসার ও পরিবারে দুজন দুজনের পরিপূরক; কেউ কারও প্রতিপক্ষ নয়।

এখানেই ইসলামি ফিতরাত ও ফেমিনিজমের পার্থক্য। ইসলাম যেখানে নারী-পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক বানিয়ে সুস্থ পরিবারব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, ফেমিনিজম মুসলিম নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ দেখাতে চায়। এতে করে সহজে সংসার ও পরিবার ব্যবস্থায় ধস নামানো সহজ হয়। দ্বীনী ঘরানায় এই মানসিকতা প্রবেশ করানোর সহজ ও নেক মাধ্যম হলো-সাংসারিক জীবনে ইসলামের ফিতরাতকে আড়াল করে ফরজ-ওয়াজিবের আলোচনা তুলে ক্রমশ দূরত্ব ও তিক্ততা তৈরি করা। ফেমিনিজম যেন আমাদের মধ্যে সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে না পারে-এ ব্যাপারে আমাদের ভাই ও বোনদের সতর্ক থাকা জরুরি। এ থেকে বাঁচতে হলে ইসলামে পারিবারিক ব্যবস্থার সামগ্রিক আলোচনা বেশি বেশি করা জরুরি।

শাস্ত্রত বন্দিত্ব

লেন্সের কাজ কী? এর মাধ্যমে আমরা 'দেখি'। লেন্স কথাটা শোনাযাত্র হয়তো আমরা চশমা, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীন বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের কথা ভাবি। কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক যে চোখ, অ্যানাটমিতে সেটারও একটা অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'লেন্স'। এই লেন্সটা তার আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে চোখের ফোকাল দূরত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিভিন্ন দূরত্বে থাকা বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব রেটিনা হয়ে আমাদের মস্তিষ্কে যায়। তখন আমরা ওই বস্তুটাকে দেখতে পাই।

যার চোখে সমস্যা রয়েছে, সে চোখে চশমা বা লেন্স পরে। ওই কৃত্রিম লেন্সটা তার পাওয়ার অনুযায়ী প্রাকৃতিক চোখের লেন্সটার সাথে একটা সমঝোতায় আসে। তাই খালি চোখে যেই জিনিসটা অস্পষ্ট দেখা যেতো, চশমা দিয়ে সেটা স্পষ্ট দেখা যায়। আবার অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সও চোখের লেন্সের সাথে সমঝোতা করে। তাই ব্যাক্টেরিয়াম বা মঙ্গল গ্রহের এমন সব জিনিস দেখা যায়, যা খালি প্রাকৃতিক চোখে দেখা যায় না।

আমাদের চিন্তাধারার সামনেও এরকম একটা লেন্স থাকে। এটাকেই আমরা বলি 'দৃষ্টিভঙ্গি'। ধরুন, আপনি পৃথিবীটাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের লেন্স দিয়ে দেখেন। তাহলে বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি মানুষ সম্পর্কে আপনার নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত বা অনুভূতি থাকবে।

চোখের সামনে একটাই লেন্স থাকবে, এরকম কোনো কথা নেই। আপনি যদি চাশমিশ হন, তাহলে আপনার প্রতিটি চোখে দুটি করে লেন্স থাকবে। একটা প্রাকৃতিক চোখের, আরেকটা চশমার। তেমনি এথনিসিটির দিক দিয়ে বাঙালি হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় দিক থেকে আপনি মুসলিম হতে পারেন। অর্থাৎ, বাঙালিয়ানার লেন্সের সাথে ইসলামেরও একটা লেন্স আপনার চোখে আছে। তখন কুরআন মাজীদ, আরবি ভাষা বা রোহিঙ্গা মানুষদের নিয়েও আপনার আলাদা অনুভূতি থাকতে পারে। আবার চশমা পরেও কেউ চোখে দূরবীন লাগিয়ে দূরের জিনিস দেখতে পারে। তাহলে লেন্স তিনটা হয়ে গেলো। এভাবেই আপনি রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থক হতে পারেন। তাহলে বাঙালিয়ানার লেন্স, ইসলামের লেন্স আর আওয়ামী লেন্স মিলে আপনার একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠলো।

এখানে লক্ষণীয় যে, 'দৃষ্টিভঙ্গি' শুধু চিন্তার জগতে আটকে থাকে না। মানুষের কথা আর কাজ তার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, উপরের তিনটা লেন্সের অধিকারী হলে

আপনি বাঙালিসুলভ খাবার খাবেন, বাঙালিসুলভ পোশাক পরবেন, হয়তো শুক্রবার দুপুর বেলায় সালাত আদায় করবেন, রমাদ্বানে সিয়াম সাধনা করবেন, এভাবে জীবনের প্রতিটা দিক ধরে ধরে বিবেচনা করলে দেখা যায় আমাদের চিন্তাধারার সামনে বেশ কয়েকটি বা এমনকি অসংখ্য লেন্স লাগানো থাকতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো, এরকম কোনো লেন্স ছাড়া দুনিয়াটাকে দেখা সম্ভব কি না। সেটা বোঝার জন্য আমরা আমাদের প্রাকৃতিক চোখের কথা ভাবতে পারি। লেন্স ছাড়া চোখ আসলে হয় না। কারণ অ্যানাটমিক্যালি 'লেন্স' চোখেরই একটা অংশ, চশমা পরুন বা না পরুন, দূরবীন লাগান বা না লাগান। তেমনি আপনার-আমার চিন্তাধারা অবশ্যই অবশ্যই কোনো না কোনো ideology দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। Ideology এর লেন্স ছাড়া একদম raw অবস্থায় আপনি কখনোই দুনিয়াটাকে দেখতে পারেন না। Ideology ছাড়া পৃথিবীটাকে দেখতে চাওয়ার অর্থ হলো চিমটা দিয়ে খুঁটে চোখ থেকে লেন্স, রেটিনা, কর্নিয়া বের করে ফেলার চেষ্টা করা। আপনি লেন্স পাল্টাতে পারবেন, কিন্তু খুলে রাখতে পারবেন না। আর এই লেন্সগুলো এমনই ওতপ্রোতভাবে আমাদেরকে ঘিরে আছে যে, তারা প্রায় অদৃশ্য। আমরা বুঝতেই পারি না যে আমরা ideology এর খাঁচায় বন্দী। খাঁচা কেন বললাম? কারণ এই ideology গুলো আপনার-আমার সামনে ভালো-খারাপ, নৈতিক-অনৈতিক, বৈধ-অবৈধের একটা জগত গড়ে তোলে। এই জগতটার বাইরে আমরা দেখতে পাই না, ভাবতে পারি না।

এসব লেন্সের ব্যাপারে একটা কথা স্পষ্ট। এসব লেন্স আমরা নিজেরা বানাইনি। কেউ না কেউ বানিয়ে দিয়েছে। আমরা তার একটা বা কয়েকটা লেন্সকে গ্রহণ করে নিয়েছি। আবার যারা লেন্সগুলো বানিয়েছে, তারাও যে খুব মৌলিক কাজ করেছে তাও না। হয়তো তার বানানো লেন্সটা এরও আগে তৈরি হওয়া দুই বা ততোধিক লেন্সের সিন্থেসিস! এবং প্রতিটি লেন্সই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতায় অনন্য। কখনো বা নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে একটা আরেকটার সাথে ঠোকাঠুকিতে লিপ্ত। এখানে এসেই 'মুক্তচিন্তা' বা 'মুক্তমনা' কথাগুলো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

এর সবচেয়ে ক্লিয়ার উদাহরণ মনে হয় ভাষা। এই যে আমি এই লেখাটা লিখছি বা আপনারা পড়ছেন, ভাষার কিছু নিয়ম মেনে না নিলে এটা সম্ভব হতো না। কোন ধ্বনি কোন বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা হবে, বর্ণগুলো দেখতে কেমন হবে, পার্টস অব স্পীচগুলো কোন সিরিয়ালে বসবে সবই কেউ না কেউ নির্ধারণ করে দিয়েছে। সচেতন বা অবচেতনভাবে আমরা তা শিখেছি

বা আমাদেরকে শেখানো হয়েছে। সেজন্যই এই লেখাটির মাধ্যমে অর্থপূর্ণ ভাবের আদানপ্রদান সম্ভব হচ্ছে। ভাষাও কিন্তু একটা লেন্স, একটা ideology, একটা খাঁচা!

এটা আপনার-আমার চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে তা নির্ধারণ করে দিচ্ছে অনেকক্ষেত্রেই।

আমি ফেমিনিজমের মাধ্যমে আরেকটা খুব সরলীকৃত উদাহরণ দিচ্ছি। বোঝানোর সুবিধার্থে। ফেমিনিজমকে vilify করা বা আনুষঙ্গিক জটিলতাগুলোকে অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য না। ধরুন আপনি একজন নারী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বাভাবিকভাবেই আপনার যা করণীয়, সেগুলো করেই আপনার জীবন কাটছে। এমন সময় কোনো এক নারীবাদী এসে আপনাকে জানালো, "তুমি ভাবতেসো নেচারালিই তোমার এইসব কাজ করার কথা, না? মোটেও না! শুনো, কেউ নারী হয়ে জন্মায় না। বরং তাকে নারী হিসেবে গড়ে তোলা হয়।" (সিমোন দ্য বোভোয়ারের একটি বৈপ্লবিক উক্তির সারনির্যাস) তখন আপনি হঠাৎ খেয়াল করলেন, আরে তাই তো! এই সমাজ ঠিক করে দিয়েছে আপনি কোন খেলনা দিয়ে খেলবেন, কী কাপড় পরবেন, কোন কোন কাজ করবেন। তাই আপনি সমাজের আরোপিত এসব প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।

এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে। সমস্যাটা হয় যখন আপনি ভাবেন যে আপনি 'মুক্ত' হয়ে গেছেন। নতুন একটা কথা শোনামাত্রই যে আপনি সেই আইডিয়াটা লুফে নিলেন, তার মানে আপনি একটা লেন্স পাল্টে অন্য আরেকটা লেন্স পরলেন। আপনি একটা খাঁচায় ছিলেন, অন্য আরেকটা খাঁচা সামনে ধরা মাত্রই আপনি আগেরটার শিক ভেঙে লাফ দিয়ে নতুন খাঁচায় চলে গেলেন। আপনার সামনে তো দুটোই অপশান ছিলো-শার্ট পরা অথবা কামিজ পরা (আগেই বলেছি, খুব সরলীকৃত উদাহরণ দেবো। ফেমিনিজম কেবলই শার্ট-কামিজের দ্বন্দ্ব নয়)। সমাজ আপনাকে কামিজ পরতে বলতো, বিদ্রোহ করার পর আপনি শার্ট পরলেন। এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচায়। অথবা সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের 'জেন্ডার-নেউট্রাল' পোশাক বানালেন, সেটাও আপনার মাথায় আগে থেকে ফিট করা বিভিন্ন পোশাকের ডিজাইনের সিন্থেসিস মাত্র। শীঘ্রই এই খাঁচার নিজস্ব সীমাবদ্ধতাগুলো আপনার সামনে স্পষ্ট হবে। আপনি নতুন খাঁচা খুঁজবেন।

আমাকে সমাজবাদের খাঁচা থেকে আপনি পুঁজিবাদের খাঁচায় নিতে পারবেন। এটা যে আগের খাঁচাটার চেয়ে ভিন্নরকম, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা কি আগের খাঁচাটার চেয়ে

ভালো? এর উত্তরটা অবশ্যই আলোচনাসাপেক্ষ, এমনকি তর্কসাপেক্ষ; এবং অতি অবশ্যই (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) প্রমাণসাপেক্ষ, যেটা আবার নির্ভর করবে কোন কোন বিষয়কে আপনি প্রমাণ বলে মানতে রাজি আছেন সেটার উপর।

খাঁচাগুলো এমনই। এই সমগ্র অস্তিত্বশীল জগত হলো খাঁচার একটা সিরিজ। কিন্তু খাঁচাগুলো স্বীকার করে না, তারা যে খাঁচা। এমনকি খাঁচার অধিবাসীরাও জানতে পারে না যে, তারা খাঁচায় আছে। কখনো যদি কেউ জানতে পারেও, তাহলে সে বড়জোর এক খাঁচা ভেঙে বা খুলে অন্য খাঁচায় চলে যায়। গিয়ে সেই নতুন খাঁচাটাকেই ভাবে 'মুক্তি'। এভাবেই একদল লোক নিজেদের পছন্দের খাঁচার গায়ে 'মুক্তচিন্তা' আর 'মুক্তমন' এর ঝাঁ-ঝকঝকে সাইনবোর্ড টাঙায়। খাঁচাবাসীরা কখনো জানতেও পারবে না খাঁচার এই সিরিজের বাইরে কী আছে, আদৌ কিছু আছে কি না।

তবে একটা কাজ অবশ্যই আপনি কৃতিত্বের সাথে করতে পারবেন। আপনি স্বেচ্ছায় একটা খাঁচা বেছে নিবেন এবং স্বীকার করবেন যে, আপনি খাঁচায় আছেন। সেই সাথে খাঁচা নিজেও স্বীকার করবে যে, সে একটি খাঁচা। প্রবল সম্ভাবনা আছে যে, নিজের ব্যাপারে অনেস্ট এই খাঁচাটাই হয়তো অন্য সব খাঁচার চেয়ে সেরা হবে, এবং হয়তো এটাই আসলে 'মুক্তি'।

এই খাঁচাটার নামই ইসলাম। আপনি এখানে ঢুকতে চাইলে আপনাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে যে, আপনি আল্লাহর দাসত্বের শিকল গলায় পরতে চলেছেন। শুনতে প্রথম প্রথম ভয় লাগবে। কিন্তু ঢোকার পর আপনি দেখবেন যে, খাঁচার শিকগুলো আপনাকে বন্দী করেছে না, বরং বাইরের ঝড়ঝাপটা থেকে রক্ষা করেছে। কখনো যদি আপনি এই খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে যান, তাহলে অবশ্যই নিজেকে তাগুতের খাঁচায় আবিষ্কার করবেন। দাসত্ব মানুষের জন্মগত অধিকার। সৃষ্টিগতভাবেই আপনি কারো দাস না হয়ে থাকতে পারবেন না। মনিবের জায়গায় যদি আপনি আল্লাহকে না রাখেন, তাহলে সেই জায়গাটা খালি পড়ে থাকবে না। অবশ্যই অবশ্যই তাগুত বা মিথ্যা উপাস্যরা এসে সেই জায়গা দখল করবেই করবে। লা রইবা ফীহ!

“দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করলো যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাত। আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকারগুলো থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের অভিভাবকেরা হচ্ছে তাগুত, সে তাদেরকে আলো থেকে

অন্ধকারগুলোর দিকে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের বাসিন্দা, এরা চিরকাল সেখানে থাকবে।"
[সূরাহ আল-বাক্বারাহ (২): ২৫৬-২৫৭]

পার্থিব সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকেও কিন্তু আমরা নানারকম দাসত্বের মাঝে পার্থক্য করে থাকি। ঘরের লোকদের জন্য যে চা বানায়, তাকে তুচ্ছার্থে আমরা বলি চাকর। আবার ব্যাংকের বড় পদে যে চাকরি করে, তাকে আমরা খুব সম্মান দেখাই। তাগুতের দাসত্ব আর আল্লাহর দাসত্বের মাঝেও পার্থক্য আছে। আল্লাহর দাসত্ব অপমানের নয়, বরং সম্মানের। কুরআনে যেসব জায়গায় বড় বড় নিয়ামাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেসব জায়গায় আল্লাহ 'আব্দ (দাস/বান্দা, বহুবচন 'ইবাদ) শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহর জন্য বিরাট মর্যাদা ছিলো ইসরা-মি'রাজের ঘটনা। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

"পবিত্র ও মহীয়ান তিনি (আল্লাহ) যিনি তাঁর বান্দাহকে (মুহাম্মাদ) রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি কল্যাণময় করেছি। তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্য। তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরাহ বানী ইসরাঈল (১৭):১]

মৃত্যু বা কবর থেকে উত্থান বা শেষ বিচারের সময় নেক লোকদেরকে বলা হবে,

"হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মাঝে शामिल হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" [সূরাহ আল-ফাজর (৮৯):২৭-৩০]

যারা জাহান্নামে যাবে, তারাও আল্লাহর বান্দা ছাড়া
কিছুই না। কিন্তু জান্নাতিদেরকেই আল্লাহ বিশেষভাবে নিজেদের দাস বলে সম্মানিত করেছেন।

জীবন যেহেতু একটিই, এবং তা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কোন লেন্স পরতে চাই, কোন খাঁচায় থাকতে চাই, কার গোলামি করতে চাই।

আমাদের নারীরা: উম্মাহর প্রাণ

আল্লাহ এমনি এমনি আমাদেরকে মুসা আ. ও ফিরাউনের সংঘাতের কথা বলেননি। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তুলে ধরেছেন সংঘাতের স্বরূপ,

'আর আমি চাইলাম সেই দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতা বানাতে, আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাতে।' (সূরা আল-কাসাস ৫)

এ শক্তির হাতবদল আল্লাহ শুরু করেছেন একজন নারীর হাতে,

'আর আমি মুসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম, 'তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। আর তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তা করবে না। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত করব।' (সূরা আল কাসাস (৭))

ইসলামের শত্রুদের সাথে আমাদের যুদ্ধের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো-নারী। জয় বা পরাজয় আসে নারীদের হাত ধরেই। এসব শুধু বক্তব্য আর কবিতাই নয়, বরং এক কঠিন বাস্তবতা। আমাদের অবশ্যই এদিকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

এই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, শ্রেষ্ঠ জাতির পুরুষরা কোথায়। তাদের অনেকেই জেলে, অনেকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, অনেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কে তাদের পরিবারকে রক্ষা করে, সন্তানদেরকে লালনপালন করে এবং জাতি গঠন করে? নারীরাই এর মূল কারিগর। সকল প্রশংসা আল্লাহর, নারীদের মাঝে অল্পকিছু খুঁত ও সমস্যার উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও নারীদের পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াহ আজ অবধি ভালোভাবেই সফল।

আমাদের নারীরা দ্বীন থেকে সরে যাচ্ছে। আমাদের সমাজ যখন নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের সীমা আরোপ করে দিয়েছে, শরিআহর দেওয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তখন থেকেই সংঘাত শুরু। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া, সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা, তাকে নীচু চোখে দেখা এবং তাঁর ওপর সকল জাহিল বিষয়-আশয় চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আর এসবের সুযোগ নিয়েছে। লিবারেল জাহিলিয়াহ। তারা নিরীহ নারীদেরকে

ব্যবহার করে স্বার্থ হাসিল করে নিয়েছে। এসব শয়তানরা নারীদেরকে মিউজিয়ামের শো পিচ কিংবা বাইজির মতো প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত করে। তাই আমাদের মতো দাঈদের জন্য দুটো চ্যালেঞ্জ সামনে আসে-সামাজিক জাহিলিয়াহ ও লিবারেল জাহিলিয়াহ। দুটো জাহিলিয়াহ থেকেই আমাদের বোনদের বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব। ইসলামই সঠিক পথ। আমাদের নারীদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে, তাদেরকে উৎসাহ জোগাতে হবে, তাদের কাজের মূল্য দিতে হবে, শরিআহর সীমার মধ্যে থেকে তাদের শিক্ষা, কাজকর্মের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, তাঁর সম্পদ ও উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এভাবেই নারীমুক্তি আসবে।

শয়তানের রাস্তাকে রুদ্ধ করে দিতে হবে। সে কেবল বিয়েতে বেশি মোহরানা না, যৌতুক পর্যন্ত এনে দিয়েছে। আমাদেরকে ইসলামের জ্ঞান তুলে ধরতে হবে। যৌতুককে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে, মোহরানার ক্ষেত্রে কম মোহরানায় উৎসাহিত করতে হবে, "কম মোহরানা, বেশি বারাকাহ"। জিনার প্রসার হচ্ছে, নারী-পুরুষ পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা সত্ত্বেও সামাজিক এসব বাধার কারণে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না। মোহরানা কমিয়ে এনে আমাদেরকে এসব অনাচারের রাস্তা বন্ধ করতে হবে। ভ্রান্ত সামাজিক কুপ্রথা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সামাজিক, বংশীয় অবস্থান একই থাকতেই হবে-বিষয়টি সত্য নয়। কুরাইশের মতো সম্ভ্রান্ত বংশের নারী যাইনাব বিনতে যাহাশের সাথে রাসুল নিজ হাতে আজাদ দাস য়ায়েদ বিন হারিসের বিয়ে দিয়েছেন। অনেককেই দেখেছি, দরকার হলে মেয়েকে আইবুড়ো করে রাখবে, কিন্তু তারপরও অন্য বংশ, দেশ হলে বিয়ে দেবে না। আর একটু নিচে হলে তো কথাই নেই। এদেরকে শরিআহর ভাষায় বলা হয়েছে, জালিম অভিভাবক। তারা শরিআহর সাথে সাংঘর্ষিক কাজ এবং বোকামির কারণে অভিভাবকত্ব হারায়।

নারীরাই উম্মাহর শক্তি। নারীদের স্বল্পতাই আমাদের পরাজয়। নারীদের প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে, তাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমরা এ পথের পুরুষদেরকে পরাজিত হতে দেখেছি, কিন্তু আমাদের বোনরা কখনো পরাজিত হননি। তাদের মধ্যে আমরা প্রবল ধৈর্য, কঠিন ইখলাস, ঈমান এবং স্থিরতা দেখেছি। ফিলিস্তিনের মা-বোনরা তো আল্লাহর মিরাকল। তাদের অনেকের সংগ্রাম, ধৈর্য, দৃঢ়তা শত মুজাহিদের চেয়েও বেশি। আরব উপদ্বীপেও আমরা এমন অনেক নারী দেখেছি। তারা পুরুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে অনেক পুরুষকেও তারা লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন। সকল প্রশংসা মহামহিম আল্লাহর। পশ্চিমেও অনেক অনারব ভাইয়ের স্ত্রীদের মাঝে আমরা পাহাড়সম ঈমান দেখেছি। তাদের মতো ঈমান পশ্চিমের বেশিরভাগ ভাইদের মধ্যে দেখিনি।

আরব শরণার্থীদের মধ্যে নারীদের ঈমান, ইখলাসের আধিক্য খুবই সাধারণ। বোনরা আমাদের কাছে এসে অভিযোগ করেন যেন আমরা তাদের স্বামীকে আরও বেশি আমল করতে বলি। তারা যে তাদের পরিবারের ঈমান-আমল নিয়ে এত বেশি সচেতন, এটাই তাদের ঈমানের প্রমাণ। তারা আল্লাহর কাছে নিঃসন্দেহে অনেক পুরুষের চেয়েও বেশি সম্মানিত।

পশ্চিমা শয়তানরা পর্দানশীন নারীর অবস্থান ও পর্দা নিয়ে যে পরিমাণ উঠেপড়ে লেগেছে, সেটাই আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় তারা আসলে কী নিয়ে বেশি ভীত। উম্মাহর নারীদেরকে তারা যদি শেষ করে দিতে পারে, তাহলে উম্মাহ শেষ হয়ে যাবে। ফ্রান্স এত সমস্যা থাকতে হিজাব নিয়েই কেন উঠেপড়ে লাগল, এত অনাচার থাকতে কেন হিজাবই তাদের নিষিদ্ধ করা লাগল তার কারণ সহজেই বোঝা যাচ্ছে। অনেক দেশ করেছে, খুব শীঘ্রই অনেক পশ্চিমা দেশ ফ্রান্সের দেখানো পথেই হাঁটবে। তারা কোটি কোটি ডলার খরচ করে দিনের পর দিন রিসার্চ করে কীভাবে পরিবারপ্রথা ভেঙে দেওয়া যায়, মুসলিম নারীকে 'উদার' বানিয়ে প্রদর্শনীর বস্তু বানানো যায়, ঈমান কেড়ে নেওয়া যায়। বোঝাই যাচ্ছে, নারী ইসলামের শেষ দুর্গ, শক্তিশালী কেব্লা। এ যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

আমাদের নারীদেরকে শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষাই নারীকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। অশিক্ষিত নারী নিজেই নিজের শত্রু। সে তাঁর স্বামী, ঘর ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আমাদেরকে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। দাঈ, আলিম ও মুমিনদের দায়িত্ব হলো সামাজিক কুপ্রথা থেকে শরিআহর বিষয়গুলোকে আলাদা করে মানুষকে বোঝানো। সামাজিক কুপ্রথাই লিবারেল জাহিলিয়াহর হাতিয়ার। এটা ব্যবহার করেই তারা নারীদেরকে টেনে নিয়ে যায় তাদের মিশমিশে অন্ধকারে।

আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং প্রশংসা আমাদের মুমিনা মা, বোন ও কন্যাদের জন্য। আমাদের ধৈর্যশীলা স্ত্রীদের জন্য আমাদের অনেক ভালোবাসা, দোয়া এবং কৃতজ্ঞতা। তারা বাদে আমরা কিছুই না, আমাদের সন্তানদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই তাদেরকে ছাড়া, তাদের অগ্রসরমান পদচারণা ছাড়া আমরা পরাজিত।

তারা চার

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি হলেন খাদিজা যা.। তিনিই ছিলেন প্রথম মুমিন। ইবনে কাসির রাহিমাল্লাহ বলেন, 'যদি দুটি বিষয় এক করে দেখা হয় তাহলে বোঝা যায়, খাদিজা রা. ছিলেন এই কাফিলার প্রথম অভিযাত্রী। তিনি ছিলেন পুরুষদের চেয়েও অগ্রগামী।' তিনি বাসুলুল্লাহ -ওপর ঈমান আনা প্রথম মানুষ। খাদিজার রা. কোন গুণটি তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে? কেন তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার একজন? এটি কি তার ক্যারিয়ারের জন্য? নাকি তার ইলমের জন্য? আমাদের বোনদের বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখা উচিত।

মারইয়াম আ., আসিয়া আ., ফাতিমা রা.-এ চারজন নারীর মধ্যে আমরা সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য দেখি তার মধ্যে প্রথমটি হলো, তারা প্রত্যেকেই দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। তাদের আল্লাহর ওপর আস্থা ছিল খুবই শক্তিশালী। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ইয়াকিনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ইয়াকিন হলো ঈমানের এমন পর্যায় যেখানে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাদের ঈমানকে টলাতে পারে। এটি এমন অবস্থা যখন মানুষ যা দেখে বা শোনে তার চেয়েও বেশি সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। বিষয়টি এমন যে আপনি সালাতে আপনার সামনে আল্লাহকে দেখছেন কিন্তু তিনি সেখানে নেই। চারজনই সে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

আমরা যেকোনো একজনের কথাই বলি। ধরুন আসিয়া রা.। তিনি ছিলেন ফিরআউনের স্ত্রী। একজন নারী চাইতে পারে এমন সবকিছু উনার সামনে ছিল। একজন দুনিয়াদার নারী অনেক সম্পদ, বিলাসী জীবন, ক্ষমতাবান স্বামী, দাস-দাসী চাইতে পারে। এমন সবকিছুই তাঁর ছিল। কিন্তু আসিয়া রা. সবকিছুই আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে এমন একটি প্রাসাদে রেখেছিলেন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর চেয়ে বিলাসী আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি আল্লাহকে বললেন,

'আল্লাহ, আমি জান্নাতে তোমার পাশে একটি বাড়ি চাই।'

[সূরা আত-তাহরিম ১১)

আল্লাহ তাকে সম্পদ, ক্ষমতাবান স্বামী সব দিয়েছেন। কিন্তু নাই। তিনি এসবকে পায়ে ঠেলেছেন। বরং তিনি সেই স্বামী থেকেই আশ্রয় চেয়েছেন,

'হে আল্লাহ, আমাকে ফিরআউনের কর্মকাণ্ড থেকে হিফাজত করুন।'

[সূরা আত-তাহরিম: ১১]

তাঁর এমন ত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি এমন আস্থা ইয়াকিন প্রকাশ করে। খেয়াল করুন, আসিয়া আ. কিন্তু খুবই খারাপ ও জঘন্য পরিবেশে থাকতেন। তার চারদিকেই ছিল সবাই কাফির ও জালিম। এতকিছু সত্ত্বেও তিনি তাঁর অন্তর আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। এটিও শক্তিশালী ঈমানের লক্ষণ। অবস্থা যাই হোক, আপনিই বিজয়ী হবেন। আল্লাহ আপনার প্রতি সৎ থাকবেন। বাকিদের ব্যাপারটাও এমন। সুতরাং তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তারা ইয়াকিনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

দুই নম্বর যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি তা হলো, তারা প্রত্যেকেই একজন ভালো মা ও একজন ভালো স্ত্রী ছিলেন।

নারীবাদী বা নারীবাদী চিন্তা লালনকারী বোনদের হয়তো এ কথাটি ভালো লাগবে না। কিন্তু বাস্তবতা এটাই। তারা কেউই তাদের ক্যারিয়ারের জন্য সমাদৃত ছিলেন না। তাদের মধ্যকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো তারা ভালো মা ও ভালো স্ত্রী ছিলেন। আসিয়া আ. ও মারিয়াম আ-দুজনই দুজন রাসুলের অর্থাৎ মুসা আ. ও ঈসার আ. মা ছিলেন। খাদিজা রা. সম্মানিত হয়েছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ -কে সাহায্য করে। তিনি তাঁর ব্যবসার জন্য সমাদৃত হননি। বরং এ ব্যবসা তার কোনো কাজে আসেনি। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর একজন ভালো স্ত্রী ছিলেন। তিনি চরম দুরাবস্থায়ও রাসুলুল্লাহ ﷺ -কে সাহায্য করে গিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ সবসময় খাদিজা রা. কে পাশে পেয়েছেন।

ফাতিমাও রা. ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী স্ত্রী। একটা উদাহরণ দিই। আলী রা. শুনলেন যে রাসুল ﷺ বেশ কিছু দাস পেয়েছেন। তিনি ও ফাতিমা রা. মনস্তির করলেন, তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যাবেন ও দাস চাইবেন। ফাতিমার রা. খুব কষ্ট হচ্ছিল ঘরের কাজ করতে। তাই তারা আয়েশার রা. কাছে তাদের সমস্যা খুলে বললেন। ফাতিমাকে রা. খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। পানি তোলা, পেষণ-সহ অনেক কঠিন সব কাজ। পরবর্তী সময়ে আয়েশা রা.

রাসুল ﷺ -কে জানানোর পর তিনি আলি রা.-এর বাসায় যান। আলি রা. হাদিসটি বর্ণনা করছেন। তিনি বললেন, "আমরা যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় গেলাম তখন রাসুল ﷺ এসে হাজির হলেন। আমরা তাকে দেখে ওঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু রাসুল ﷺ বললেন, 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো'। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। তিনি আমাদের দুজনকেই স্পর্শ করে ছিলেন।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে রাসুল ﷺ ও ফাতিমাকে রা. এতই ভালোবাসতেন যে তিনি বলেছিলেন, 'ফাতিমা আমার অংশ। যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়। যা তাকে আনন্দ দেয় তা আমাকেও আনন্দ দেয়।' ফাতিমা রা. ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর একমাত্র জীবিত সন্তান। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ চাইতেন উনার মেয়ে যেন সর্বোত্তম জীবন পায়, সবচেয়ে ভালো কিছুই অর্জন করে।

রাসুল ﷺ এর কাছে দাস ছিল। কিন্তু তিনি কি দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, 'আমার কাছে তোমার জন্য দাসের চেয়েও ভালো কিছু আছে। তুমি ঘুমাতে যাওয়ার আগে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নাও। এটাই তোমার জন্য ভালো।' ফাতিমা রা. পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটির সবচেয়ে ভালো কন্যা। রাসুল ﷺ জানতেন হাত খসখসে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফাতিমা রা. ঘরের কাজ করতেন। তার হাতের চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যা করছ তাই করতে থাকো।' তাকে দাসের বদলে আমল শিখিয়ে দিলেন।

আলি রা. পরবর্তী সময়ে বলেন, ফাতিমা রা. এত কঠোর পরিশ্রম করতেন যে হাত প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা হওয়া পর্যন্ত তিনি ময়দার চরকা ঘুরাতেন। ঘাড়ে দড়ির দাগ পড়া পর্যন্ত তিনি কুয়া থেকে পানি তুলতেন। পোশাক নোংরা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঘর পরিষ্কার করতেন। চেহারায়ে ধোঁয়ার ছাপ ফেলা পর্যন্ত তিনি রান্না করতেন। ইনিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির মেয়ে। রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতেন তাঁর কী অবস্থা। বিনিময়ে তিনি কী পেলেন? তিনি হয়ে উঠলেন পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের একজন। জ্ঞানের মাপকাঠিতে আয়িশা রা. ছিলেন খাদিজা রা. ও ফাতিমা রা. থেকে অনেক ওপরে। কিন্তু তাও তিনি খাদিজা রা. ও ফাতিমার রা. সমকক্ষ হতে পারেননি।

বোনেরা। আপনাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুন। আপনারা কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দেবেন ভেবে দেখুন। আপনাদেরকে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। আমরা ইসলামি প্রতিক্রিয়াশীল হব

না। কিন্তু আপনারা জেনে নিন, কোথায় আপনাদের সত্যিকার সম্মান। কোথায় আপনাদের পুরস্কার। সবাই সবার দায়িত্ব পালন করুন, সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জন করুন। কিন্তু প্রাধান্যের জায়গাগুলোকে হারিয়ে ফেলবেন না। তাই আসুন সে পথেই হাঁটি যে পথে চলে গিয়েছেন খাদিজা রা., ফাতিমা রা.. আসিয়া রা., মারইয়াম রা.। আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুন। আমিন।

রেফারেন্স

১. আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারী সমাজ
২. বিহাইন্ড ফেমিনিজম
৩. ফেমিনিস্ট প্রোপাগাণ্ডা
৪. ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০
৫. মুসলিম বাংলা অ্যাপ
৬. হয়তোবা.কম